সপ্তচক্র

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ-
অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৯

মুদ্রণ ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)
(Bangla, Hindi, English)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মুখবন্ধ

এই পরিদৃশ্যমান জগতে অনন্ত বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে। এক একটি বস্তু মহাকাশের অনন্ত কোটি অণুপরমাণুর সংমিশ্রণে গঠিত। এই অণুপরমাণুর মিশ্রণেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই দেহযন্ত্র। আর আমাদের দেহযন্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টি রহস্যের কথা। প্রতিটি সৃষ্টবস্তুর ভিতর প্রকৃতির সমস্ত ক্ষমতা জাপ্য অবস্থায় বিরাজমান, শুধু দেহযন্ত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার অপেক্ষায়।

আমাদের মধ্যে যে বুঝ, বিচার, বিবেচনা, তা শুধু দেহযন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই দেহযন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রকৃতির সুর কাজ করে চলেছে, তেমনি অনন্ত বিশ্বের প্রতি বস্তুতে বস্তুতে, মহাকাশে মহাশূন্যে গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জেও এই সুর একই তালে একই সমতার ধারায় কাজ করে চলেছে। সুতরাং আমরা যে দেহযন্ত্র বহন করে চলেছি, তার সাথে মহাসৃষ্টির সবকিছুকেই বুকে নিয়ে চলেছি।

আমাদের দেহবীণাযন্ত্রের মাধ্যমে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টবস্তুকে সকলের নিজ নিজ বুঝে আনবার জন্য ও অনন্ত বিশ্বের সুর সাধনার জন্য সাতটি চক্র দান করেছেন। এই সপ্তচক্রের প্রতিটি চক্রে অনন্ত মহাশূন্যের সমস্ত ক্ষমতা জাপ্য অবস্থায় বিরাজমান।

সমস্ত বিশ্বের সবকিছু সমস্যার সমাধান করবার জন্য দেহের মধ্যে এই সপ্তচক্র এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, যে কেউ সাধনা করলে যেকোন অবস্থায় যেকোন মুহূর্ত্তে নির্বাণ হতে পারে, সিদ্ধি হতে পারে, মুক্তি হতে পারে, সমাধি হতে পারে। তারজন্য পূর্বজন্মের কর্মফলে কোনকিছু আটকাবে না। ভাগ্য বা অদৃষ্টের উপরও নির্ভর করতে হবে না।

জন্মের সাথে সাথে স্রষ্টা দেহযন্ত্রের মধ্যে এই চক্রগুলো দিয়েছেন সৃষ্টিরহস্যকে, বিশ্বরূপকে বুঝবার জন্য; তাঁর স্বরূপকে জানবার জন্য। যেকোন ব্যক্তি যেকোন অবস্থায় যখন যা চিন্তা করছে, ঐ চক্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সপ্তচক্রে সাতটা স্তর আছে। এক এক স্তরের এক এক নাম— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার। এই চক্রগুলো দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্যমান। মূলাধার থেকে সহস্রার অবধি যে সুর বাঁধা আছে, তার সাথে অনন্ত সূর্যশক্তির সাতটি বর্ণের বর্ণনাও বাঁধা আছে। সৃষ্টি রহস্যের সবকিছু সমস্যার সমাধান করবার জন্য দেহক্ষেত্রের মধ্যে এই সপ্তচক্রে স্রষ্টা এমনভাবে তাঁর শক্তি ছড়িয়ে রেখেছেন যে, যে কেউ সাধনা করলে তারমধ্যে আপনিই জেগে উঠবে সেই আদি সুরের ঝঙ্কার।

আমাদের দেহে সপ্তচক্রে যে সপ্ত তার বাঁধা আছে, তাকে আয়ত্ত করতে হলে নাদধ্বনির চর্চা করতে হবে। সৃষ্টির যে নাদধ্বনি, সেই নাদধ্বনি অন্তর্নিহিত আছে আমাদের মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীতে। মূলগ্রন্থিতে যে মূলসুর লুকিয়ে আছে, জাপ্য হয়ে আছে, তাকেই জাগাবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। সাধনায় সেই অনন্তসুরকে ধরার জন্যই মন্ত্র। গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্র সম্বল করে, আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারে সুর বেঁধে মহাশূন্যের ধ্যান করলে, অনন্ত মহাকাশের অনন্ত শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে, জন্মমৃত্যুর সীমানার মাঝে প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে গতি মিলিয়ে, নিজ নিজ দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রে ঝঙ্কার তুলে, খুঁজে বের করতে হবে সেই নিখোঁজের সুর। বের করতে হবে মহাসৃষ্টির এই সপ্তচক্রের অপার রহস্য।

সপ্তচক্রের অপার রহস্যের সন্ধান দিতে, সকলের দেহক্ষেত্রে সপ্তসুরের ঝঙ্কার তুলতে, সৃষ্টির অনন্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করতে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সপ্তচক্রের বাস্তব বিষয়বস্তুর বস্তুত্বকে বুঝাবার জন্য কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট-ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৪২-তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো **'সপ্তচক্র'**।

পরিশেষে জনাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম।**

চপল মিত্র

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৯ *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

আমি যে স্তর থেকে এসেছি, যে সম্পদ নিয়ে এসেছি, তাতে তোমাদের এই সহস্রারের স্তর পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছি, যেটা বিরল।

১৫৫ পার্কষ্ট্রীট, কোলকাতা-১৬
২২শে অক্টোবর, ১৯৬৭

অনন্ত বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে। একেকটি বস্তু বহু বস্তুর সংমিশ্রণ। এখানে কারও কোন নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নেই। সবাই একই harmony-তে প্রকৃতির একই ধারায় সুসজ্জিতভাবে গড়ে উঠেছে। মহাকাশের সব কিছু এভাবেই গড়া। তার থেকেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই দেহযন্ত্র। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র একই আকর্ষণের মাধ্যমে একই আবর্তন বিবর্তনের ধারায় আবর্তিত হয়ে চলেছে। একই সমতার সুরে সকলে একসূত্রে গাঁথা। দেহযন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা সব জানতে পারছি, বুঝতে পারছি, কি আশ্চর্য।

এই আশ্চর্যের কথা চিরকালই বলতে হবে। আমরা যে জানছি, বুঝছি, সেটা আবার আমাদেরই বুঝের যন্ত্রে সাড়া দিয়ে চলেছে। কিভাবে বুঝছি, কি করে জানছি, কেউ কি পরিষ্কারভাবে বলতে পেরেছি? তাই বারে বারে বলতে হচ্ছে একই কথা। দেহযন্ত্রের মাঝেই আছে বুঝ। সেই বুঝই আমি বুঝলাম। আবার আমি যে বুঝলাম, দেহযন্ত্রের মাঝেই সেই বুঝ হ'ল। এইভাবেই নির্দিষ্ট সময়ে ধারাবাহিকভাবে সব হয়ে যাচ্ছে।

কি অদ্ভুত, কি সুন্দর সৃষ্টির এই রহস্য। আমাদের মাঝে যে

বুঝ, এই বুঝের যন্ত্রের সীমানা শুধু দেহযন্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই যন্ত্রের সীমানা অনন্ত মহাকাশের ও বিশ্বের সমস্ত বিষয়বস্তুর সাথে সাধা ও গাঁথা। দেহযন্ত্রের ভিতরে যেমন কাজ চলেছে, জগতের মাঝে প্রতি বস্তুতে বস্তুতে মহাকাশে, মহাশূন্যে, গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জেও তেমনি কাজ চলেছে একই সুরে, একই তালে, একই সমতার ধারায়। আমরা যে দেহযন্ত্র বহন করে চলেছি, তার সাথে মহাজগতের সবকিছুকেই বুকে নিয়ে চলেছি আমরা। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। নাকের যে দুটি ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র, এই ছিদ্র দুটি দিয়ে মহাসাগরের বাতাস টেনেই আমরা জীবনধারণ করছি। মহার্ণবের মতো বারিধারা পান করেই তৃষ্ণা নিবারণ করছে জীবকুল। দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জগতের তেজ থেকেই। **দেহযন্ত্রটা কি করছে? যন্ত্রটা চলছে কি কারণে? অনন্ত মহাশূন্যে গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জে যা কিছু চলছে, তাদের সাথে চরম যোগাযোগের সূত্রে থেকে, সেই সত্তা থেকে, সেই বস্তু থেকে যে বস্তু টানছে, সেই বস্তু থেকেই সেই সত্তা থেকেই দেহ যন্ত্র দিচ্ছে চেতনার সুর ও চৈতন্যের সাড়া।** এই চৈতন্যকেই প্রাণ বলে অভিহিত করা হয়।

আমাদের দেহবীণাযন্ত্রের মাধ্যমে অনন্ত বিশ্বের সুর সাধনার জন্য সা রে গা মা-র মতন সাতটি চক্র রয়েছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার নামে এই সপ্তচক্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্যমান। প্রতিটি চক্রের মূলেই আছে সেই নাদধ্বনি। তত্ত্ববিদ্‌দের সুরকে আরও গভীর সুরে আনবার জন্যই সেই সুরধ্বনির ধ্বনি প্রতিটি চক্রেরই মূলমন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেহের প্রতিটি গ্রন্থির গ্রন্থে গ্রন্থে সেই ধ্বনিই ধ্বনিত হচ্ছে। জীবগণের সুবিধার্থে সা-রে-গা-মা-র মতন সুর সাধবার জন্য, সুরকে তালে মানে এনে সুরজ্ঞেতে

পৌঁছানোর জন্য যে সাধনা, দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রের যে সুরসাধনা, এও যেন ঠিক তাই। সা-রে-গা-মা-র সপ্ত স্বরলিপিতে যেমন সর্বসুর গাঁথা, ঐ সপ্তচক্রের চক্রে চক্রেও অনন্ত মহাশূন্যের সর্বব্যাপ্তমান সর্বশক্তি প্রতিটি চক্রে বাঁধা। **দেহের মধ্যে এই চক্রগুলিও একপ্রকার ভাষার মতন। ভাষা শিখবার জন্য প্রথমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে সর্ব-ভাষা যেমন গাঁথা, এই বিশ্বরূপ— এই পঞ্চভূত, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এমনিভাবে জীবলোকে বাঁধা। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন কারিগরীতে হয় রূপের পরিচয়, গ্রন্থের পরিচয়। ঠিক তেমনি মূলাধার হ'তে সহস্রার অবধি যে সুর বাঁধা আছে, তার সাথে অনন্ত সূর্যশক্তির সাতটি বর্ণের বর্ণনায় যে ঝঙ্কার ওঠে, সাধকের তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়।** সেই বর্ণনার কোন তুলনা মেলে না।

প্রতিটি চক্রে যোগ, ধ্যান রয়েছে। এই সপ্তচক্রে নাদধ্বনির সাধনা, সুর সাধনা করার জন্য এই সমস্ত জগৎ, কত গ্রহ, কত নক্ষত্র রয়েছে। এত কিছু আছে যে, বলে শেষ করা যায় না। সব চিন্তা করা না গেলেও একটা অক্ষরকে নাদধ্বনিকে ভাবা যায়। এই যে অনাহত (বক্ষঃস্থল)— এখানে শিব শক্তি; সাধারণ হয়ে এই পৃথিবীতে সাধনা করতে করতে এক একজন কত বড় হয়ে গেছেন। (বেদমন্ত্র...) এমন সুন্দর সাধনা। সমস্ত বিশ্বের সবকিছু সমস্যার সমাধান করবার জন্য দেহের মধ্যে এই সপ্তচক্র এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে, সাধনা করলে আপনি হবে। যে কেউ সাধনা করলে অতি সহজেই পেতে পারে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

মূলাধার হ'তে সহস্রার অবধি চক্রাদি ব্যাবহারিক দিক দিয়ে যা নামাকরণ হয়েছে, তার মধ্যে আজ্ঞাচক্র, যার নাম দ্বিদল— সে সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। সাধকেরা আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে

(দুই ভ্রূ-র মাঝখানে) চিন্তা করেন। **প্রকৃত দ্বিদল মেরুদণ্ডের উপরে, মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে। মেরুদণ্ডের চার আঙ্গুল উপরিভাগের মধ্যে দ্বিদলের চিন্তা। চিন্তার প্রথম সূত্রপাত ভ্রূ-র মধ্য হতে, তাই গিয়ে পৌঁছেছে মস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগে। মস্তিষ্কের ভিতরে সাধারণতঃ যে সমস্ত অংশগুলো আছে, তা স্বাভাবিক মতে খুব sensitive parts এবং তা বহুরকম কারুকার্যের দ্বারা মণ্ডিত। এত অজস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী সম্মিলিত আছে যে, যা কিছু যখন চিন্তা করা হয়, মস্তিষ্কে (সহস্রারের চক্রে) যে brain ও matter, তা একই সূত্রে এমনিভাবে কার্য করতে থাকে। মনোনিবেশের সাথে সাথে একজাতীয় sensation-এর উৎপত্তি হতে থাকে। অর্থবোধে যার যত বেশী বিরাটত্ব, তার তত বেশী সেইভাবে secretion-এর উদ্ভব হয়।** আজ্ঞাচক্র (দ্বিদল) ও সহস্রার (সহস্র দল)— বলা যেতে পারে সাগর ও নদীর সঙ্গম অবস্থা। সাধক তখন নদীর শেষ অবস্থা থেকে সাগরের প্রথম অবস্থায় ধরি ধরি ভাব। এমনিভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত চক্র একই সূত্রে রয়েছে আবদ্ধ।

পাহাড়িয়া একজন সাধক, তার বয়স অনেক, সে ত্রাটক যোগ করতো। অনাহতের (বক্ষঃস্থলের) উপর একটা স্থান আছে, তার চারিদিকে সে আলো দেখে। আবার একটা আলোর মাঝখানে নিজেকে দেখে সে চিৎকার করে, আর ওদিক থেকে সাড়া দেয়। আবছা আবছা পাহাড়গুলো দেখে কুয়াশার মতন। দার্জিলিং-এর উপরে গ্যাংটক ছাড়িয়ে আমি গেছি। 'ও' (সেই সাধক) শুনেছে, 'এক বাচ্চা এসেছে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।' আমার কাছে এসে বলে, ''আমি এই অবস্থায় আছি। আমাকে সাহায্য করতে পার?''

আমি বলি, ''আমাদের দেশে খড়কুটোর মূর্ত্তি দেখে বুঝা

যায় না, এটা কোন্ মূর্ত্তি হবে?''

সে বলে, ''তাহলে আমার এটা কি হবে?''

আমি— তুমি এক মেটে, দু'মেটের কথা শুনেছ?

তুমি একটা মাটির পোঁচ দিয়েছ। আরও কয়েকটা পোঁচ দিতে হবে।

সে— আমি সেই মাটি কোথায় পাব?

আমি যে মাটি (আধ্যাত্মিক সম্পদ) এনেছি, সে জানে। আমি বলি, ''তুমি এটা কোথায় পেলে?''

সে— এক সাধক এসে এক খোঁচা দিয়ে আমার এই অবস্থা করে দিয়ে গেছে।

আমি— দেখ, আমি আর একটা খোঁচা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি খোঁচা খেতে খেতে যাও।

সে— দাও। তুমি আমাকে আর একটা খোঁচা দাও।

আমি— দেখ, আমি একটা জিনিস দেব। তুমি উঠে যাবে। তুমি তৈরী তো?

সে তখন বসে গেছে। আমি একটা খোঁচা দিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে সে বলে, ''কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে।''

আমি— ওটা সাগর; সাদা নয়। দুধে আলতা রং। সূর্য উঠছে।

সে দূর থেকে সাগর দেখছে। আমি বলি, ''আচ্ছা, তুমি বসো। আমি একটু ঘুরে আসি।'' ওকে বসিয়ে রেখে আমি চলে গেছি। ঘণ্টা চারেক পরে এসে দেখি, সে (সাধক) সাধনায় ডুবে গেছে। ডাক দিয়েছি, 'উত্তর দেয় না।' আমি ধাক্কা দেওয়াতে লাফিয়ে উঠেছে। শুধু বলে, ''বাঃ কি সুন্দর। আমি এখানেই (এই অবস্থাতেই) থাকতে চাই। আমার খুব ভাল লাগছে।''

আমি— এরপর আরও আছে। তুমি সাগরের ওপারে

যাও। তোমাকে শুধু সাগরের পাড়ে আনলাম। এতদিন শুধু লেকের বাতাস খেয়েছ। তুমি সাধনার গভীরে ডুবে থাক।

'ওকে' (সেই সাধককে) আজ্ঞাচক্রে উঠিয়ে দিয়েছি। একে তো দুধের সাগর। তার উপরে সূর্যের কিরণ পড়েছে। তারপর ওকে আরও একটু উঠিয়ে দিয়েছি। এমন ঢেউ আসছে, ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে। সে ভাবছে, ওই ঢেউয়ে বোধহয় মিলিয়ে যাবে। প্রতিটি ঢেউ দেখে ভাবছে, ওটাতে বুঝি ডুবে যাবে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছি।

সে আমাকে বলছে, ''তুমি হাসছো?''

আমি— হ্যাঁ। তুমি সাধনা ছেড়ে ঢেউয়ের ভয় করছো? ঠিক আছে, ঢেউ আসবে না।

তারপর ফস্ করে ঢেউটা এসে ওর গায়ে লেগেছে। ওকে ভিজিয়ে দিয়েছে। আমাকে বলে, ''তুমি যে বললে, ঢেউ আসবে না।''

আমি— দেখ, ঘরের মধ্যেও Fog (কুয়াশা) আসে। ভিজিয়ে দেয়, জান না? তুমি এরপর দেখতে চাও?

সে— এরপরেও আছে?

আমি— হ্যাঁ, আছে। তুমি কালীমূর্ত্তি ভালবাস?

তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? দেখতো, এর মধ্যে কিছু দেখা যায় কি না?

সে কালীভক্ত। তারপর দেখছে, মা কালী হাত নেড়ে নেড়ে যাচ্ছে। সে বলছে, ''অপূর্ব, অপূর্ব।'' আরও দেখছে, সাধারণ হাঁটা চলা যেমন, সেইভাবে মা কালী আসছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার সময় সূর্য যখন ডুবে গেছে, মূর্ত্তি চলে গেছে।

আমি সেই সাধককে বলি, ''তুমি প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে দেখবে। তারপর আর একজন এসে খোঁচা দিলে আবার অন্যরূপ

হবে।''

সে— আবার আর একজন কি আসবে?

আমি— আমি তো আর আসবো না। আর খোঁচা দেব না।

প্রত্যেকটি সাধক সাধনা করতে করতে এইভাবে চক্রে আটক হয়ে পড়ে। কখনও মণিপুরে, কখনও অনাহতে, কখনও আজ্ঞাচক্রে আট্‌কা পড়ে যায়। আমাদের জন্মের সাথে সাথে দেহের মধ্যে এই চক্রগুলো বিশ্বরূপকে বুঝবার, স্বরূপকে জানবার জন্যই দেওয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন অবস্থায়, যখন যা চিন্তা করছে, ঐ চক্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রতিনিয়তই বৃত্তির নিবৃত্তির জন্য, আমাদের চাহিদা, আমাদের অভাব পরিপূরণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। 'আমি চাই', এই অভাবটুকুনু পরিপূর্ণ হচ্ছে পাওয়া হলে। কিন্তু পেয়েও আবার চাই। এ যেন শূন্য স্থান পরিপূরণের জন্য অনন্ত প্রয়াস। তাই পরিপূর্ণও চলছে, আবার অভাবও চলছে।

শূন্য পূর্ণ যেমন দিনরাতের মত কার্য করে যাচ্ছে; এই দিন ও রাত— উভয় উভয়কে পরিপূর্ণ করতে চাইছে। তাতে আলোও আসছে, অন্ধকারও আসছে। এখন এই দুটো আবার একই রূপে অবস্থিত, কেউ কাউকে ছাড়া নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই চাহিদা ও অভাব ও শূন্য, মনে হয় যেন একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ। তা না হলে বস্তুকে নাড়াচাড়া করলেই সেই শূন্যতেই গিয়ে অবস্থিত হয় কেন? সুতরাং এই শূন্য যাকে nothing বলুক, আর যাই বলুক, তার একটা influence বা প্রভাব, সেটা যেভাবেই হউক হয়ে আসছে, যার জন্য এই এই বস্তুগুলো উদ্‌গ্রীব হয়ে সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই গতি প্রতি বস্তুতে যখন আছে, চক্রেতেও আছে। তাই চক্র যখন সর্ববস্তুতে, তখন যেকোন বস্তুকে চিন্তা করাই সেই বিরাটত্বকে লাভ করা, বুঝতে পেরেছ? আবার চিন্তা

না করে মনের নানা অবস্থার সৃষ্টি করে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, তাতেও ঐ ফলেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

'আজ্ঞা' নামে যে চক্র তাতে তেজঃপূর্ণের জ্যোতির (সূর্যের) চিন্তাতে ধ্যানস্থ হলে চক্রের সমস্ত সূক্ষ্ম অংশগুলো ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ তেজঃপূর্ণ অবস্থায় পরিণত হতে থাকে। অবশেষে ঐ একই অবস্থায় পরিণত হয়। দেহের ভিতরে ঐ তেজের আলোতে আলোকিত করে ফেলে। তখন সাধক আনন্দে তন্ময় হয়ে যায়, আত্মহারা হয়ে যায়।

আর যারা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের তাগিদে, অভাবের তাড়নায়, ক্ষুধার তাড়নায় ঘরে ঘরে ভিক্ষার ঝুলনা নিয়ে দ্বারে দ্বারে মাগছে, তাদের দিকে সাধক করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সাধক তাদের উদ্দেশ্যে বলছে, "হে ভিখারী তুমি আর্ত্তনাদ করছো কোন্ অবস্থার জন্য? ক্ষুধার আবেগে কেন কাঁদছো? এই ক্ষুধা চিরন্তন ক্ষুধার আভাষ মাত্র। তুমি ভিক্ষার ঝুলনা (থলি) দিয়ে এই ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারবে? এই ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করতে হলে আবৃত্তি করো বিরাটকে। এই ক্ষুধার আবেগে তুমি এমনিভাবে সেই চিরন্তন ক্ষুধাকে নষ্ট করো না। জীবন তোমার এমনিভাবে বয়ে যাচ্ছে 'ক্ষুধা ক্ষুধা' বলে। কিন্তু এই ক্ষুধার সাড়া শুধু দেহবীণাযন্ত্রে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যে নয়। এটা অন্তর্নিহিত সুর। এই চাওয়া চাওয়া নয়। আবার চাওয়াটি তোমার ঠিকই আছে। এই চাওয়া বিরাট চাওয়ার নমুনা। তাই তুমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যে আছ, সত্যের উন্মাদনায় আছ। ভুলে গেছ নিজেকে। সিংহ ভেড়ার দলে থেকে ভুলে গেছে নিজেকে। তার সিংহত্ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু ভুলে যাওয়ার মাঝে শুধু ঘাস খাচ্ছে। তুমিও কিন্তু তাই, ঝুলনা নিয়ে মাগছো। এই মাগা (চাওয়া) মাগা নয়। দেখবে, তোমার এই মাগা কোন্ চাওয়ার সুর এবং এই ক্ষুধা,

কোথা হতে আগমন? এই চাওয়া পাওয়ার মাঝে তুমি এগিয়ে যেতে থাক; তারজন্য যাত্রিকের station. সেই station-এ গিয়ে ticket কেটে বসে থাক। গাড়ী যখন আসবে, কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেবে। ধৈর্য ধর। তাই চক্রে মনোনিবেশ করা আর টিকিট কেটে গাড়ীতে ওঠা, একই কথা। তুমি লাইন মাফিক চলে যাও। আর এই দ্বিদল কেন্দ্রেই হোক, সহস্রার কেন্দ্রেই হোক্, চিন্তাতে মগ্ন থাকলে ঠিক পৌঁছে দেবে সেই কেন্দ্রস্থলে। তখন দেখবে, কোন্ চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে তুমি চেয়ে চেয়ে ঘুরেছিলে। কোন্ সুপ্ত নিনাদ এতদিন সুপ্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে। তখন তুমিও অবাক হয়ে যাবে এই সূক্ষ্ম শিল্পীর (স্রষ্টার) কার্য কতই না মধুময়।

তুমি সেই মধুময়ের ধ্যান করছো, সেই শিল্পীর ধ্যান করছো, সেই সূক্ষ্মকারীর ধ্যান করছো এবং তুমিও যে সে, তোমাতেই যে সে তখন বুঝবে। যে যতবেশী গভীর চিন্তায় তন্ময় থাকবে, মন ততবেশী এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করবে। এই বিশ্ব বিরাটের সমস্ত শক্তিগুলো তোমার ভিতরে প্রবাহিত হতে থাকবে।

অনেক সাধক সাধনা করে যারা বড় হয়ে গেছেন, তাঁরা বলেন, ''তুমি উত্তরদিকে নাক বরাবর (সোজা পথে) অগ্রসর হও। তুমি তোমার দিক ঠিক রেখো। তবে সাগরও দেখবে, পাহাড়ও দেখবে।'' সাধারণভাবে জপ করতে থাকলে এইভাবে নিয়ে যায়। তবে সাধারণতঃ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গ্ল্যান্ডগুলো ফুটে যায় (স্ফূরণ হয়)।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। নিদ্রিত অবস্থায় আমরা যে স্বপ্ন দেখি, এই স্বপ্নটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারছি? নিদ্রা তো এক ধরণের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। **প্রতিদিন সবাই আমরা নিদ্রার**

মাধ্যমে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুর পথে পাড়ি জমাচ্ছি; মৃত্যুর বাগান থেকে ঘুরে আসছি। সেই নিদ্রিত অবস্থায় বা সাময়িক মৃত অবস্থায় এই যে স্বপ্ন দেখা, তার মাধ্যমেই আমাদের জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এটা কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য, প্রমাণে প্রমাণিত।

নিদ্রিত অবস্থায় দেহটা মৃতবৎ থাকলেও, সে অবস্থাতেও মন ঠিকই তার কাজ করে চলেছে। ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘুমের মাঝেও স্বপ্নে কত কি ঘটে যায়। স্বপ্নে তুমি নানা জায়গায় ঘুরছো, কত কি কথা বলছো। তুমি কিন্তু ঘাটে ঘুমিয়েই আছ। এমনও দেখা গেছে, কেউ হয়তো স্বপ্নে হিসি করেছে, এদিকে বিছানা ভিজে গেছে। স্বপ্নে হয়তো সাঁতার কেটেছে। সকালে উঠে দেখে, ঠাণ্ডা লেগে গেছে। স্বপ্নকে যদি অলীক বল, মিথ্যা বল, অবাস্তব বল, তবে জেগে উঠে স্বপ্নের কাণ্ডকীর্তির কথা তুমি বাস্তবে বল কি করে? গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় এটা।

ঘুম থেকে উঠে তুমিই বলছো, ''কাল রাত্রে স্বপ্নে বাবার সাথে দেখা হল। তারপর ছোটবেলার সেই গ্রামে গেলাম। পাঠশালার মাষ্টার মশাই'র সাথে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর ভজহরির দোকানে গিয়ে কত মিষ্টি খেলাম। হঠাৎ দেখি, সাপে তাড়া করছে আর আমিও ছুটছি। সাথে সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে গেলাম।'' স্বপ্ন যদি অলীক হয়, তবে ঘুমের মধ্যে তুমি যা যা করেছো, জেগে গিয়েও তুমি সে সব ঠিক ঠিক বর্ণনা করলে কি করে? তা বলার অধিকার তোমার থাকে কি করে? সেখানে তো কোন ফাঁকি নেই। এই যে ঘুমিয়ে থেকেও জাগরণের মতো কাজ করে যাওয়া—

এতো বড় সাংঘাতিক কথা। এই যে ক্ষমতা, এটা যে প্রকৃতির কত বড় দান তা চিন্তাও করা যায় না।

বালি, অঙ্গার প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জলকে ফিল্টার (Filter) করে, ঘোলা জলকেও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করা যায়। স্বপ্নের মাধ্যমেও মনের সেই জাতীয় ক্রিয়াই চলেছে। জাগ্রত অবস্থায় বুদ্ধি, বিবেচনা বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে বারবার আহত হয় বলেই, মনের অনেক ইচ্ছাই সফল হয় না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্বচ্ছ মনে কাজ করা, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় মন যেন মুক্তাকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। তখন দ্বিধাহীনভাবে তুমি যা চিন্তা কর, সেটাই যেন সফল হয়ে যায়। মনের এই অবস্থায় তুমি ইচ্ছে করলে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পার, মনটাকে কেউ তখন বাধা দিতে পারছে না। জাগ্রত অবস্থায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যুক্ত ঘোলাটে মনটা যেন স্বপ্নের ছাঁকনিতে পরিষ্কার হয়ে, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সুন্দরভাবে প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে গতি মিলিয়ে, আপনমনে অবাধ গতিতে অনন্ত ধারায় বইতে থাকে। দেহরূপ পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে, মুক্ত পাখী যেন মুক্তাকাশে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। জাগ্রত অবস্থায় ক্ষুদ্র সত্তাটিই যেন নিদ্রার মাধ্যমে স্বপ্নের অবস্থায়, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিজের ব্যাপক সত্তাকে, তার বিরাটত্বকে অনুভব করতে পারে।

তাই সাধকেরা কি করেন? তাঁরা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাত্রাটাকে জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। স্বপ্নে বীজমন্ত্র জপ হতে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি ও অতি সহজে ফল লাভ করা যায়। পঞ্চাশ বছর জপ করলে যে কাজ হয়, স্বপ্নে সেটা ৫ মিনিটে হতে পারে। তারজন্যই স্বপ্ন। এমনি একটা ঢিল ছুঁড়লে দশ হাত যাবে। কিন্তু সেই ঢিলে (অর্থাৎ মনের চিন্তাধারায়) ধ্যান,

জপরূপ বারুদ মিশালে অতি অদ্ভুত কাজ হবে। দুর্লভ জিনিস যাতে সহজে পেতে পার, সেজন্যই স্বপ্ন।

দুইটা জগৎ— এক জগৎ হচ্ছে এই বাস্তব জগৎ। তারমধ্যে রোগ শোক আছে, দুঃখ-দৈন্য আছে, ব্যথা-বেদনা, আঘাত প্রতিঘাত সবই আছে। আর এক জগৎ হচ্ছে স্বপ্ন জগৎ। এক জগতে এখানে তুমি হাটবাজার করছো, ইচ্ছা মতন চলছো। আরেক জগতে স্বপ্নে ইচ্ছামতো তা পার না। একভাবে এই বাস্তব জগৎটাও স্বপ্নের মতো। কারণ এখানেও কোন কিছু চিরদিন থাকে না। কাউকেই ধরে রাখতে পার না। যাকে ধরতে যাচ্ছ, মৃত্যু তাকেই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

প্রতিদিনের ঘুম ক্ষণিকের মৃত্যু। তাই ঘুমও এক জাতীয় সমাধি। প্রতিদিনের ঘুমের মাঝে যে স্বপ্ন দেখি আমরা, সে স্বপ্নের কথা যদি জাগ্রত অবস্থায় মনে থাকে, তবে মনে থাকার প্রমাণকে মেনে নিয়েই, মৃত্যুর পরবর্ত্তী solid অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। স্বপ্নে ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, তাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি গুরুত্ব দিচ্ছি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের ঘটনাবলীকে মনে রাখার ব্যাপারটিকে। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের ঘটনা যদি মনে না থাকতো, তাহলে সব minus করে দিতাম। স্বপ্নের মধ্যে যে ঘটনা ঘটছে, তা যেন ঘুম ভাঙার পর তোমাকে সজাগ করে দিয়ে বলছে, "মৃত্যুর পরও কেমন নাচানাচি করে ছেড়ে দিলাম।"

তুমি যখন ঘুমিয়ে আছ, তখনও সজাগ। আবার জেগেও সেই সজাগ। ঘুমিয়ে থেকে স্বপ্নের মাঝে যে সজাগ, তার সেই মাত্রাকে জাগরণের সজাগের মাত্রার সাথে যুক্ত (plus) করতে পারলেই, স্বপ্নের যে কার্যাবলী, জাগ্রত অবস্থায় যা অসম্ভব বলে মনে হয়, জাগ্রত অবস্থাতেও অতি সহজে তুমি সে সব অসাধ্য

সাধন করতে পারবে। তাই সাধনার জগতে ঘুম সমাধির এত মূল্য। জাগ্রত অবস্থা আর মৃত্যুর পরের যে solid অবস্থা— এই দুইয়ের মাঝখানে মৃত্যু যেন ছাঁকনীর কাজ করছে। ঘুমের চরম অবস্থাই তো মৃত্যু।

স্বপ্ন তো সবাই দেখছে। সেই স্বপ্ন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে, খেয়াল করবে। স্বপ্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই যে ঘুমের পর প্রতিদিনই সজাগ হচ্ছ, তার মানে সাময়িক মৃত্যুর (ঘুম সমাধির) পরও প্রতিদিনই সজাগ হচ্ছ। আবার ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে যে সজাগ ছিলে, ঘুম ভেঙে সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে সেই সজাগের কথা মনে করতে পারছো। কতবড় কথা এটা। প্রকৃতির এটা কতবড় দান। **মৃত্যুর পরও সজাগ কিছু না থাকলে, স্বপ্নের সেই সজাগের কথা মনে করতে পারতে না। এর একটি কথাও অবান্তর নয়, অবাস্তব নয়। প্রতিটি কথাই Mathematical Calculation করে করা হয়েছে।** ঘুমিয়ে থেকেও যে, তুমি সজাগ, তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো স্বপ্নের মাধ্যমে। সজাগ না থাকলে, ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নের কথা বলতে পারতে না। এ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।

একটা সত্তা সবসময়ই আমাদের মাঝে জাগ্রত থাকে। এই জাগ্রত সত্তা সবসময়ই সজাগ থেকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তুমি যদি সর্বদা জাগ্রত থেকে মৃত্যুর কথা স্মরণে রেখে চলতে পার, সমাধিতে যে ঘটনা ঘটে, সমাধি ভঙ্গের পরও যদি তা মনে থাকে, তবেই হবে চরম ও পরম প্রাপ্তি। সেদিন ঐ ঘটনাগুলো বাস্তব জীবনেও ঘটতে বাধ্য। যে কোন সমাধিতে যে কোন ঘটনা ঘটবে, এটাই নিয়ম। এই যে ঘুম সমাধি, এটাই স্বপ্নের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে চরম মাত্রায় গিয়ে শেষ সমাধিতে (মৃত্যু) পরিণত হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন চিরকালই থাকবে। আবার

জাগ্রত হলে সে ঘটনা স্মরণেও থাকবে।

এই যে দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী (গায়ক) চলে গেল। কিছুদিন আগেও ল্যান্সডাউনে তোমাদের গান শুনিয়েছে। মা আছে ৯০ বছর বয়স। যাওয়ার আধঘণ্টা আগে মাকে বললো, ''আমি যাচ্ছি। ক্ষমা করো।'' ছেলেদের বললো, ''তোমাদের ঠাকুরের কাছে রেখে গেলাম।'' আমার ফটো বুকে নিয়ে 'জয়গুরু জয়গুরু' করে, কি সুন্দর চলে গেল। কত গান শুনেছ। আজ সে আশীর্বাদ নিয়ে চলে গিয়েছে। সে আশীর্বাদ পেয়ে গেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। গৌরীশঙ্করকে (আবাসিক) দিয়ে আশীর্বাদী ফুল পাঠালাম। সেটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল।

আর একটা সংসার রয়েছে স্বপ্নের জগতে। স্রষ্টা (প্রকৃতি) বলছেন, ''এই সংসারে যা কিছু করছো, সেই ইচ্ছাটা স্বপ্নে প্রকাশ কর। তাহলেই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে।'' তোমাদের আগেও বলেছি, আমার এক শিষ্য নবদ্বীপ হালদার, বাংলাদেশে থাকে। সে হাঁড়ি মাথায় নিয়ে বিক্রি করে। আর মনে মনে জপ করে। আমি বলেছি, ''তুমি স্বপ্নে জপ করবে।''

সে (নবদ্বীপ) ঘরে এসে রাত সাতটায় শুয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখলেই সে জপে বসে। হঠাৎ দেখে, স্বপ্নে এক সুন্দরী মেয়ে এসে তার দেখাশুনা করছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ''ঠাকুর, ঐ মেয়েটা কে?''

আমি বলি, ''তুই ওকে বিয়ে কর।''

সে বলে, ''এখানকার বউ?''

আমি বলি, এখানে এ (বাস্তবের বউ) থাক। ওখানে (স্বপ্নে) 'ও' থাক।

সে স্বপ্নে বিয়ে করেছে। বাচ্চা হয়েছে। প্রতিদিন রাত্রি সাতটায় শুয়ে পড়ে আর সারারাত্রি স্বপ্নে সংসার করে। স্বপ্নে দুই

বাচ্চা মারা গেছে বলে শোক করছে। সে কি কাঁদছে। তার মা বলছে, ''তোর স্বপ্নের বাচ্চা মারা গেছে। তারজন্য কাঁদছিস্?'' এই বউ (বাস্তবের বউ) ভাবছে আর হিংসা করছে। এখানে নতুন শাড়ী কেনে। শাড়ীটা পরে কিন্তু বাস্তবের বৌ। আবার স্বপ্নে স্বপ্নের বৌ-এর জন্য লাল শাড়ী কেনে। স্বপ্নের বৌ লাল শাড়ী পায় বলে, বাস্তবের বৌ হিংসা করে। একদিন ওকে ডাক দিয়ে বলি, ''তুই স্বপ্নের বৌকে হিংসা করিস্। তুই মানুষ নাকি?''

নবদ্বীপ একদিন ঘরে বসে জপ করতে করতে উঠে গেছে উপরে। ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে রাত দু'টার সময়। ওর বৌ চিৎকার দিয়ে উঠেছে। এখন সে বসে গেছে। এখন 'ও' বাংলাদেশে থাকে। তোমাদেরই ভাই। মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। ওদের কাছে বাচ্চা বয়সে এসব করেছি।

আমার কথা হল, স্বপ্ন যখন আছে, স্বপ্নের পথটা যখন আছে, অতি সুন্দর পথ। এই পথে কাজ করলে যেকোন মুহূর্ত্তে স্ফূরণ হতে পারে। এই স্বপ্নের মাত্রার সাথে বাস্তবে জাগ্রত অবস্থার মাত্রাটা যোগ করে দাও। বাস্তবের সাথে স্বপ্নের মাত্রাটা এক যোগাযোগে যুক্ত করে দিতে পারলেই অতি সহজে কাজ হবে। অতি স্বল্প আয়ু এখানে। এই স্বল্পায়ু জীবনে বহু বছরের সাধনার ফল অর্জন করার সহজ পথ হচ্ছে স্বপ্নটা। অতি সহজে সাফল্য লাভ করা যায় স্বপ্নের মাধ্যমে। তারজন্য বড় বড় ঋষিরা স্বপ্নের মাত্রার ভিতর দিয়ে কাজ করে গেছেন।

আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। হঠাৎ একদিন দেখি, গোটা তিরিশেক সাদা হাতি আমার কাছে এসেছে। আমাকে একটা সোনার চূড়ো দিয়ে গেছে। জেগে উঠেও চোখ বুঁজে বুঁজে সোনার চূড়োটা দেখছি আর ভাবছি, ''হাতির সোনার চূড়োটা কি সুন্দর।'' তখন সকাল ৫-৬টা হবে। আমি সবাইকে জাগিয়ে

বলছি, ''তোরা দেখ, কি সুন্দর চূড়ো?''

সবাই ছুটে এসেছে। কোথায় চূড়ো? খালি হাত। সেই সকালেই হঠাৎ কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। তারা ঢাকা থেকে শালগ্রাম শিলা নিয়ে আসছে। স্বপ্ন দেখেছে, নারায়ণ তার চূড়োটা আমার হাতে দিতে বলেছে। দেখ, স্বপ্নের সাথে বাস্তবের চিন্তাধারা কি সুন্দর মিলে যায়। স্বপ্নে প্রথম প্রথম যা দেখবে, প্রথম দিকে মিলবে না। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। খালি জপ কর, আর কিছু নয়। নিদ্রায় জাগরণে শুধু জপ চালিয়ে যাও।

কোন ঝঞ্ঝাটে যাবে না। ঝঞ্ঝাট আসলেও এড়িয়ে থাকবে। তোমরা ম্যাসেঞ্জার ফোর্স-এর কথা শুনেছ? তারা সবসময় আমার কাছ থেকে তোমাদের সরিয়ে নিতে চায় ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। মনে কোন দ্বন্দ্ব, সন্দেহ আসলে জিজ্ঞাসা করে নেবে। কোন কানকথায় (শোনা কথায়) কান দেবে না। আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনবে।

অনেক আঘাত আসবে। প্রতিমুহূর্ত্তে উথাল পাথাল হবে। অনেক ঝড় আসবে। তোমরা বিচলিত হবে না। নৌকার যে হাল ধরবে, আর হালের মাঝির যে হাল ধরবে, তাকে ঠিক থাকতে দিও। আমি যে দিনের পর দিন এত পরিশ্রম করে চলেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আঁতুর ঘরের মত ঘরে বসে আছি, কেন? **দুর্লভ জিনিসকে যাতে সহজে পাওয়া যায়; সেই দুর্লভ স্থানে যাতে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি, তারজন্য। সেই চেষ্টাই আমি করে চলেছি। এখানে চেষ্টা করলে রাজা হওয়া যায়, মন্ত্রী হওয়া যায়। কিন্তু ভগবৎ সত্তা, ভগবৎ প্রেম, ভগবৎ অনুভূতি— দুর্লভ বস্তু। অতি সহজে পাওয়া যায় না। যে জিনিস পেয়েছি, তা দিয়ে তোমাদের আমার প্রাণের সাথে এক করার জন্য এসেছি।**

সেই জিনিস দেবার জন্য এসেছি। একা পেয়ে আনন্দ নেই। আমি সবাইকে দিতে এসেছি।

আমি একাকী ঝড়ের বিরুদ্ধে তরী ভাসিয়ে দিয়েছি। এ হেন অপবাদ নেই যা আমাকে না দিয়েছে। আমি আমাতে অচল অটল। অনর্থক কষ্ট পেয়েছি। নানা অসুবিধা সহ্য করে চলেছি। তোমরা তো দেখছোই। আমার পরিশ্রম যাতে সার্থক হয়, সেই চিন্তাতেই কাজ করছি। **যেই জিনিস তোমাদের দিতে চাই, তাই যেন দিতে পারি। এখানে কোন কিছুই থাকবে না। আমার স্নেহ, প্রেম, ভালবাসায় তোমাদের টেনে নিয়ে যাব।** অদ্ভুত পরিশ্রম করেছি সেই বাচ্চা বয়স থেকে। ৩/৪ বছর বয়স যখন আমার, দিনের পর দিন তিতাস নদীর পাড়ে বসে কাটিয়েছি। ঝড়, বাদল উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছি। তোমরা কাজ করে যেও। আমার জন্মদিন 'কর্মীদিবস' হিসাবে পালন করা হবে।

তোমাদের মধ্যে যে সুর দেওয়া হয়েছে, তার রেওয়াজ (চর্চা) করো। **তোমাদের ভিতরে বিরাট শক্তির আধার দেওয়া হয়েছে। অঙ্গীকার করতে পারি, যতই আঘাত আসুক, আমি তোমাদের কাছ থেকে সরে যেতে পারি না। যত ম্যাসেঞ্জার ফোর্স আসুক, যাদের কানে দিয়েছি বীজমন্ত্র, তাদের কাছ থেকে সরে যাব না, এই কথা বলতে পারি। তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।**

সেই লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গস্বামী— তাঁদের পাঠানো লোক তো আমার কাছে এসেছে। মায়ের পেট থেকে পড়েই (ভূমিষ্ঠ হয়েই), আমি সেইভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য আমার স্নেহের কোল পেতে রেখেছি। **আমি একটা কাজই ভালভাবে করতে পারি। সেটা হ'ল, আমার যত খুশি আমি নিয়ে যেতে পারি।** আমি যেন আমার আইন হতে

এতটুকু সরে না পারি। তারজন্য এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমি যদি একটু ব্যতিক্রম করতে পারতাম অর্থাৎ **আমার অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তিগুলির লক্ষ কোটি ভাগের একভাগও যদি প্রয়োগ করতাম, তবে তোমাদের এখানকার যাবতীয় চাহিদা, যা এখানকার রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, সব সমাধান হয়ে যেত।** তোমরা এখানে মুখ উজ্জ্বল করে চলতে পারতে। নাম, যশ তোমাদেরও হতো, আমারও হতো। ভালভাবে চলতে পারতে। কত খুশী হতে তোমরা। কিন্তু শুধু চলতেই পারতে কিছুদিনের জন্য। কারণ এখানে সবই সাময়িক। কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়। মৃত্যু এসে সব ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনকিছুই ধরে রাখা যাচ্ছে না।

আমি আর একদিকে কাজ করতে গেছি বলেই এখানে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নাই। আমি তাকিয়ে আছি কেবল, কি করে তোমাদের সেই অনন্তধামে নিয়ে যেতে পারি চিরদিনের জন্য। তারজন্যই আমার এত ছিদ্যৎ। যীশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ— এঁরাও এই ছিদ্যতের হাত হ'তে রেহাই পায় নাই। কেসটা শেষ হলে মনে হয়, অনেকটা সরে যাবে তোমাদের ছিদ্যৎ। **আমি আমার লাইন থেকে সামান্য চ্যুত হলে, সবাইকে নিয়েই ডুবতে হবে। আমি জেনে শুনে আমার সন্তানদের (ভক্ত শিষ্য-শিষ্যাদের) ডুবাতে পারবো না।** তাই আমি ঠিক এভাবে এখানে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি না।

বহু সন্তানের বাবা হয়েছি, মা হয়েছি। বাবাকে হাত কড়া পরিয়ে হাজতে নিয়ে গেলে, ছেলে কি বাবাকে ত্যাগ করতে পারে? আমার জন্য আমার সন্তানদেরই তো দুঃখ হবে বেশী। **আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, সেই চির আনন্দধামে তোমাদের নিয়ে যাওয়া। আমি পারবো। আমি জোর গলায় বলছি, নিয়ে**

নেওয়ার মতো ক্ষমতা জন্ম হতেই নিয়ে এসেছি।

এখানে জপ করে অনেকে সিদ্ধিলাভ করেন। আর আমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই জন্মগ্রহণ করেছি। তারজন্যই বলে জন্মসিদ্ধ। প্রকৃতির ঐতিহ্যের সুর নিয়েই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এটা আমার অহঙ্কারের কথা নয়। সন্তানের কাছে বলছি বাবার কথা। তোমাদের জেনে রাখা উচিত। গ্রামে আমায় সবাই জানে। বেশীরভাগ মহাপুরুষরা বিদেশ থেকেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। আর তোমাদের ঠাকুরকে দেখতো, তিন বছর বয়স, তিতাস নদীর পাড়ে বসে আছি। ৪/৫ বছর বয়স, নদীর উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি। আমি এতটুকু ক্ষমতা নষ্ট করতে আসিনি। একটু নষ্ট করলেই তো সাংঘাতিক হতো। তা করলেই আমার রেকর্ড নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তা করবো কেন?

আমার এক শিষ্য অফিস থেকে চার হাজার টাকা নিয়েছে। ধরা পড়ে গেছে। কেস হয়েছে। আমার কাছে এসেছে। আমি আশীর্বাদ দিয়ে বললাম, ''যা খালাস পাবি।'' সে খালাস হয়ে গেল। আর আমি জমি মারার কেসে ফাঁসলাম। ম্যাসেঞ্জার ফোর্স চারিদিকে উথাল-পাথাল করছে। আমি নীরবে সহ্য করে চলেছি।

রবিবার জন্মোৎসব হলো। মঙ্গলবার বাবা চলে গেলেন। আমার হাত ধরেই গেছেন। উদ্ধার পেয়ে গেছেন। আমি বাবার সাথে কথা বললাম, ''আপনি যাচ্ছেন? যান। দেখবেন, অশ্বিনীর (অশ্বিনী চ্যাটার্জ্জী) সাথে দেখা হবে।''

বাবা— অশ্বিনীর লগে (সাথে) দেখা হবে?

আমি— হ্যাঁ।

আমাকে বললেন, ''তোমার জন্য চিন্তা করি। তুমি তো কেবল আঘাত পাও।'' সামনে যারা ছিল, তাদের বললেন, ''ওকে (আমাকে) একটু দেখো।'' বাবা কথাবার্তা বলে আমার

হাত ধরে মারা গেলেন।

আমার প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে তোমাদের আপন করে রেখেছি। একটু এদিক ওদিক করি না। একজনের অসুখ। বারে বারে আসছে আমার কাছে। তার সামনেই হয়তো আর একজনকে ভাল করেছি। কিন্তু তাকে আর ভাল করছি না। সে দুঃখ পাচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝছে। **আমি দেখছি, এই রোগে মৃত্যু হলে, তার এক জীবনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তা না হলে তাকে আরও ২০ হাজার বার জন্ম নিতে হবে আর মরতে হবে।** কি করি বলতো? আমিও ফাঁদে, সেও ফাঁদে। আবার আমার অন্তরঢালা স্নেহ ভালবাসা দিয়েও বসে আছি।

আমার জন্মমাস কার্ত্তিক তো। একটু খুলে খুলে বলি। এতজন শিষ্য— সারা বছরে মাসে মাসে কয়জন মারা যাবে, এরকম হিসাব করি। সামনের বছর ১৪২ জন মারা যাবে। যাইহোক, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। কি হলো, কি হলো না, জানতে চাইবে না। শুধু শুনে যাবে।

আমি যে স্তর হতে এসেছি, যে সম্পদ নিয়ে এসেছি, তাতে তোমাদের এই সহস্রারের স্তর পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিচ্ছি, যেটা বিরল। সাধারণতঃ আজ্ঞাচক্র অবধিই থাকে। তোমাদের এই আজ্ঞাচক্র, এই সহস্রারের স্তর খোলা। শুধু আমাকে একটু কাজ করতে দাও। আমার এত মায়া যে, আমি সবার জন্য কাঁদতে থাকি। কিছু কিছু হিসাব করি। আরও হিসাব বাকী। মাঝে মাঝে খুলে বলবো। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা অনন্ত পথের পথিক। যাত্রা পথে হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপে যেন সময় নষ্ট না হয়

হরিসভার মাঠ, সবজীবাগান, চিড়িয়ামোড়, দমদম রোড, কলিকাতা-২
৩রা মার্চ, ১৯৬১

এই ধর্মসভায় সেই উৎসব পালন করা হচ্ছে। সেই নাম ও প্রেমের উৎসব, যা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের মাঝে বিলিয়ে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু যে চৈতন্যের সংজ্ঞা নিয়ে এই জগতে নেমে এসেছিলেন, সেই আদি চৈতন্যের আদি সুর তাঁর ভিতরে স্ফূরিত হয়েছিল। সেই চৈতন্য সত্তা নিয়ে যখন জীবজগৎ আবির্ভূত হয়, তার মাঝে সেই চৈতন্যই প্রকাশ পেতে থাকে। সেই যে চৈতন্য সেই আদি শক্তির সুর, সেই মূলাধারের মূলমন্ত্র যখন তিনি (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য) জাতিধর্ম নির্বিশেষে দান করতে আরম্ভ করলেন, তাঁর ভিতর আলোড়ন করছিল চৈতন্যের সেই আদি সুর।

আদি জ্ঞান নিয়ে এলেন সেই চৈতন্য মহাপ্রভু। সত্যিকারের বিশ্বরূপের স্বরূপত্বকে জেনে জানাবার জন্য যে প্রেরণা সেই মূল নামের ভিতর দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন, জগতের সেই আদি সত্তাকে জানাবার জন্য সেই মূল নাম তিনি পথে ঘাটে দিয়ে গেলেন। সুতরাং সেই নাম সেই আদি বেদে আছে। আদি বেদই হচ্ছে আদি সুর। তিনি সেই সুরকে মৃদঙ্গের তালে তালে করতালে আপন সুরের ভিতর দিয়ে বিলিয়ে দিলেন। যেভাবে তিনি নাম বিলিয়ে গেলেন, তাতে ছিল একত্ববোধ। **ধর্মে**

জাতিতে নীতিতে যাতে বিরোধিতা না হয়, তারজন্য কোনদিকে দৃকপাত না করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সবার মাঝে একধর্ম, একজ্ঞান, একসুর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংস্কারের সুরধ্বনিতে টান দিয়ে তিনি এই নাম বিলিয়ে গেলেন।

কেন এই নাম? কেন এই নামের প্রয়োজনীয়তা? ধ্যান, জ্ঞান, নাম ও প্রেমের মধ্যে কি পার্থক্য, তা জানা দরকার। মূলমন্ত্র বা শব্দকে আশ্রয় করে তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় সকলের অন্তরে এই ধর্মের সত্তা জাগাতে লাগলেন। সমস্ত সুরকে একাকার করে কিভাবে এক সুরে পরিণত করা যায়, সেটাই ছিল তাঁর সাধনা। তারজন্য তিনি এই দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তসুরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে সুর দিতে আরম্ভ করলেন। এই দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তসুরকে একসুর করলেন। সেই নামকে চর্চা করার জন্য সেই তানে তানে অহর্নিশ জপ করার বিধি আছে। এই মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত যে সাতটা তার বাঁধা আছে, তাকেই সাধ্য সাধনাতে এক সুরে আনতে বলেছে। তাই বারেবারে এই নাম। সপ্তসুরের সাতটা স্তর আছে। এক এক স্তরের এক এক নাম নিয়ে এক একটা বেদ তৈরী হলো। **সেই নাদধ্বনি অন্তর্নিহিত আছে এই মূলাধারে, সেই কুলকুণ্ডলিনীতে। মূলগ্রন্থিতে যে মূল সুর লুকিয়ে আছে, জাপ্য হয়ে আছে, তাকেই জাগাবার জন্য এই সাধনা।** কত সাধকেরা সপ্তস্তর ভেদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মূলাধারে বীজ যখন রোপণ করা হয়, গাছ যখন অঙ্কুর নিয়ে বের হয়, স্বাধিষ্ঠানে অঙ্কুর জন্মায়। মণিপুরে গাছের ডালাপালা বের হলো। মূলাধারে যে সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, মণিপুরে সে ফণা বিস্তার করতে লাগলো। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিকুণ্ডে সেই অনাহতে গাছ যখন বাড়তে থাকে, ফুল ফুটবার আগে কলিটুকু

যেমন দেখা যায়, তেমনই দেখা গেল।

সূর্য তখনও ওঠেনি। সূর্যোদয়ের পূর্বে আকাশ ক্রমশঃ লাল হতে থাকে। সেটাই হলো সূর্যোদয়ের পূর্বাভাষ। সূর্য যেমন পূর্বভাগে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়; এই পরিদৃশ্যমান জগতে এটাই দেখা যায়। এই যে আমরা সূর্যের ওঠানামা দেখছি, সূর্য কখনও ওঠেও না, নামেও না। সে আপন কক্ষে থেকে কিরণ বিকিরণ করে কত ব্যাপ্তমান হয়ে আছে। **পৃথিবীর ঘূর্ণীপাকে আমরা সূর্যের ওঠানামা দেখছি। এই জীবনমৃত্যুর মাঝে, জ্ঞান অজ্ঞানের মধ্যে আমরা এই ওঠানামা দেখছি। আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে সূর্যের ওঠানামার মত জন্মমৃত্যুকে দেখছি। সেই জ্ঞানসূর্য চির উদীয়মান। সে কখনও ওঠে না, নামেও না।** তা মূলাধারের মূলকুণ্ডে চির দেদীপ্যমান। সাগরের জল যেন শুদ্ধ হয়ে, পানীয় হয়ে এল। সাগরের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সেই জল মাটির ভিতর দিয়ে যখন আসে, তখনই পানীয় জল, মিষ্টি জল হিসাবে পান করা হয়। সেই সর্প, সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, বিশুদ্ধ হতে যখন আজ্ঞাচক্রে এল, সেই নদী, সহস্রারের সহস্র সূর্যের সাগর হতে যার উৎপত্তি, সেই যে সূর্য, তারই চন্দ্রের স্নিগ্ধ আভায় আলোকিত হল এই আজ্ঞাচক্র। সেই আজ্ঞাচক্রে থেকে আমরা অহর্নিশ সংসারে জীবনযাপন করছি। যে দেহবৃত্তির ভাব নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছি তা আজ্ঞাচক্রের একটি ধুলিকণার স্ফূরণবৎ। বৃত্তির এইটুকু নিবৃত্তিতে আমরা উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু সেটা হচ্ছে আজ্ঞাচক্রের একটি ধুলিকণার সমতুল্য। মূলাধার হতে সহস্রারে একই সমন্বয়ের তার বাঁধা। সেই সর্বজ্ঞত্ব, সর্বদর্শিত্ব ইত্যাদি অনন্ত সূর্যের সমন্বিত শক্তি হচ্ছে এই সহস্রার। সা-রে-গা-মা-র চর্চা করলে যেমন গান শেখা যায়, সেইরূপ মন্ত্র হচ্ছে এই সা-রে-গা-মা-র মত সুর। মূলাধার হতে সহস্রারে সেই

সপ্তচক্রের সুর সাধতে বলেছে। আমাদের দেহে যে সপ্ত তার বাঁধা আছে, তাকে আয়ত্ত করতে হলে সেই নাদধ্বনির চর্চা করতে হবে। সেই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার জন্যই এই মন্ত্র। তার কেন্দ্র হচ্ছে এই দেহবীণাযন্ত্র। এই দেহবীণাযন্ত্রকে জাগানোর জন্য, সেই অনন্ত সুরকে ধরার জন্যই এই মন্ত্র। এই বোলকে বাজাতে হবে। এই বোলে বলীয়ান হতে হবে। এটা হচ্ছে সেই আগ্নেয়গিরির কুণ্ডল। সেই কুণ্ডলিনীকে জাগাবার জন্য সাধকরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। শুধু সুরের তানে, সুরের ধ্বনিতে এটাকে বাজিয়ে তুলতে হবে। সেই নাদ, সেই ধ্বনি শুধু এটাকে বাজিয়ে তুলবে। সেই বোল, সেই ধ্বনি, সেই ধারা হচ্ছে আদি ধারা। সেই ধারাতে আবির্ভূত হয়ে, নামের ধারাকে জানিয়ে দিতে মহাপ্রভু এসেছেন এই ধরাতলে।

মহাপ্রভু যে নাম দিয়ে গেছেন, যে সুর দিয়ে গেছেন, সেই একই সুর, একই বোল বাজিয়ে তোলাই হল তাঁর মন্ত্রের সাধনা। মন্ত্র হচ্ছে সুর। ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর ও বাংলায় ৩৬টি অক্ষর দিয়ে যেমন সেই সেই ভাষায় সমস্ত গ্রন্থ রচনা করা যায়, **সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি তে যেমন অন্তর্নিহিত আছে সমস্ত গানের সুর, সেইরূপ মূলমন্ত্রের মাঝেই আছে সব মন্ত্রের সুর। তারজন্যই এই দেহযন্ত্র। সেই আদি স্রষ্টার সুরকে ধরার জন্যই এই দেহযন্ত্র।** বাস্তবে লেখাপড়া শিখতে গেলে অ আ ক খ শিখে ভাষা আয়ত্ত করতে হয়, তারপর বড় বড় কবি, সাহিত্যিক কত কি হয়ে যায়। ধারাপাতের ধারাতে এই অক্ষরগুলি উলটিয়ে পালটিয়েই তো গ্রন্থ রচনা করতে হয়। এই বিশ্ববিরাটের (Universe-এর) গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা নামরূপে রয়েছে। সেই বিশ্ববিরাটের সুরই হচ্ছে এই মূলমন্ত্র, এই নাম— যেই নাম মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন। অন্যান্য মহানরা যা দিয়ে

গেছেন, সেই নামের আখ্যা ব্যাখ্যা জানা দরকার।

এই মূলমন্ত্রই হচ্ছে মূলসুর। সুতরাং আমরা দিয়ে যাব এই সুর। আজ্ঞাচক্র সহস্রারের মিলনই হচ্ছে শিবশক্তির মিলন, প্রকৃতি পুরুষের মিলন। এই শিবশক্তিকেই প্রণব আখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণ হচ্ছে আকাশ যার কোন বর্ণনা নেই। মহাশূন্যে সমস্ত অণুপরমাণু ধারাবাহিক ধারা অনুযায়ী অনুসন্ধিৎসু হয়ে একই সমন্বয় শক্তিতে ধাবমান হয়ে চলেছে। মন্থনে মন্থনে যেমন মাখন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই তেজঃপুঞ্জের মন্থনে সমস্ত শক্তি এসে পুঞ্জীভূত হয়। এই সমন্বয় শক্তির ধারা প্রতিটি সত্তায় প্রকাশিত। আমরা সবাই একই সত্তায় যে আছি, তারই প্রকাশ এই বাহ্যিক রূপ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ।

অল্প সময়ের মধ্যে সব কথা বলা যায় না। আদিবেদের শব্দধ্বনি শুধু শুনে গেলেও অনেক কাজ হয়ে যায়। মৃদঙ্গের সুরে সুরে আমরা সেই নাম করবো, সেই গান গাইবো। ধর্মের প্রকৃত অর্থ আজ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। ধর্মে আজ জাতিতে জাতিতে বিরোধিতা, নীতিতে নীতিতে বিরোধিতা। এই ধর্ম আমাদের নয়। **শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সর্বক্ষেত্রে আমরা সঙ্কুচিত হয়ে আছি। এইসব বেশীরভাগ so called মহানরা দেশের মানুষকে ভিক্ষুক তৈরী করে দেশকে বিক্রী করে দিচ্ছে।** তারা আদি বেদের অর্থ ভাল করে জানতে পারেনি। জানলে যা খুশী তাই করতে পারতো না। 'পতিতে তারিতে হবে তারিণী'। হয়ে গেছে, 'পঁচিশে তারিখে হবে বারুণী'। সূর্য সকলের এক, পৃথিবী সকলের এক, বাতাস সকলের এক। আজকে দেশকে যদি সত্যপথে চালাতে হয়, ধর্মের প্রকৃত অর্থ জানতে হবে। যারা শাস্ত্রকে সঠিকভাবে জানছে না, গুরুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা খুশী তাই ইচ্ছামতন করছে, তাদের তা করতে দেওয়া যাবে না। আমরা

chllange করতে রাজী আছি। এটা আমার অহংকারের কথা নয়। সেই হোম, যাগযজ্ঞ, অন্যের মঙ্গলকামনায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, এসব মুক্তির পথে চলে না। ধর্ম আজ ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। দেশের সর্বনাশের মূল আজ নীতি বিরোধিতার ফল। ধর্মে জাতি বিরোধিতা, নীতি বিরোধিতা থাকবে না। আমাদের ধর্ম মুক্ত ধর্ম। মুক্তভাবে মুক্তমনে বিচরণ করাই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ। বার বার বীজমন্ত্র জপে জেগে উঠবে সেই নিনাদের ধ্বনি; অন্তরের গভীরতায় গভীরভাবে নিনাদের সুর দেবে। যে সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, সেই সর্প ফণা বিস্তার করে এগিয়ে যাবে। **আমরা অনন্ত গতিশীলতার মাঝে, সেই রূপান্তরিতের মাঝে, চিরন্তন গতির পথে গতি হয়ে চলেছি। আজ আমরা পৃথিবীতে পথিক, যাত্রিক। জন্মই সন্ন্যাস, মৃত্যুই ত্যাগ। ভোগের রাস্তাই হচ্ছে ত্যাগের রাস্তা।** আমাদের অন্য কোন আশ্রম নেই। এই পৃথিবীই আমাদের আশ্রম। আমরা ভোগের রাস্তা দিয়ে ত্যাগ করতে করতে চলেছি। আমাদের এই রূপান্তরিত জগতে রূপে রূপে রূপান্তরিত হতে হতে, আজ এই পান্থশালায় এসেছি পথিক হয়ে। হে যাত্রিক, সময় কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। হাসি, ঠাট্টা বিদ্রূপের সময় নেই। আমরা তানের সুরে টান দিয়ে লয় হয়ে যাবো। আমরা আলোর পথিক, আমরা অনন্ত পথের পথিক। আমরা যাত্রা শুরু করে দিয়েছি। আমরা সেই সুরে সেই তানে তান দিয়ে, সংসারের কাজ করে এগিয়ে যাব।

সেই শিশুবয়স হতে আদি কথা, আদি তত্ত্বের সুর দান করে যাচ্ছি। তত্ত্ব জানলে সবটা জানা হয়ে যায়। অনর্গল তত্ত্বের কথা, জ্ঞান, ভক্তি-প্রেমের কথা এর ভিতর রয়েছে। আমরা মূলমন্ত্রে দেব সেই টান। একই সুরের একই মন্ত্রে আমরা বাজিয়ে যাব সেই মূলমন্ত্রের গান। মহাপ্রভু সেই নাম দিয়ে গেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা,

সুষুম্না, এই ত্রিশক্তি, এই ত্রিধারার ধারা এসে মিলিত হয়েছে এই নামে। এখানে এসে খুব খুশী হয়েছি। এইভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে উদ্যোক্তারা যে সভার আয়োজন করেছেন, সেটা খুবই সুন্দর। সংসারে এতটুকু থেকেই বৃহতে পৌঁছানো যায়। এক পাই লক্ষ ছাড়া নয়। তারা এই ক্ষুদ্র ধর্মসভাকেই বৃহতে পরিণত করতে পারেন। এক ধর্ম, এক জাত যাতে হয়, তারজন্য সবাই মিলে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ধর্মটা কি, প্রকৃত ধর্ম বলতে কি বুঝায়, সেটাই সকলকে আগে বুঝানোর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সকলের সহযোগিতা থাকলে কাজটা সহজ হয়। শুধু পূজা করা, আরতি করাই ধর্ম নয়। মাতা পিতার প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য পালন এবং সংসারের সব কর্ত্তব্য পালন করাও ধর্ম। **আমাদের বাড়ীর ৪ কাঠা জমি পৃথিবী ছাড়া নয়। কাঠার পর কাঠা যদি বাড়িয়ে যাই, সমস্ত পৃথিবীটাই আমাদের বাড়ী হয়ে যেতে পারে। আমাদের বুদ্ধি যাতে ব্যাপক হয়, তারজন্য ব্যাপক চিন্তার প্রয়োজন। ধর্মের নামে আজ যে ভিক্ষার ঝুলি আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছে, ধর্মের রূপ এরূপ (এইরকম) নয়। ধর্ম শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ।**

অনন্ত সাগর, বাতাস, সূর্য যেমন ব্যাপ্ততার সুরে ভরপুর, ধর্মও সেইরূপ সর্বব্যাপ্ত। সকলেই আমাদের ভাই। আমরা সবাই এক জাত। আমাদের মধ্যে যেন কোন বৈষম্য না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধর্ম সেই মিলনের কথা, এক সুরের কথাই জানিয়ে দিচ্ছে। সকলে মিলে যেন একতানে, একসুরে, একগানে থাকতে পারি। আমাদের মন্ত্রও তাই। মন্ত্রের অর্থ এক তান, এক জ্ঞান। শিশু যখন কাঁদে ওঁয়া ওঁয়া, এতেই আছে প্রণবের সুর। শিশুকে কেউ প্রণব মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যায় না। শিশুর ওঁয়া ওঁয়ার মধ্যেই প্রণব মন্ত্র। মা যখন বাচ্চা প্রসব করে উঃ উঃ, এতেও

প্রণবের ইঙ্গিত আছে। কেউ যখন হোঁচট খায়, যখন অজ্ঞান হয় উঃ উঃ ধ্বনি বেরিয়ে আসে। ইহাতে প্রণব আছে, মন্ত্র আছে। মৃত্যুর মুহূর্ত্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও বলে, উঃ উঃ। মণিপুর হতে বিশুদ্ধে, বিশুদ্ধ হতে আজ্ঞাচক্রে সেই ধ্বনিই ধ্বনিত হয় উঃ উঃ। কই কোন I.C.S. তো মৃত্যুর সময় ইংরেজী কবিতা আওড়ায় না। এই যে উঃ উঃ, প্রণব মন্ত্র রয়েছে এতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নৈসর্গিক সুর যাহা, তাহাই শাশ্বত। সুর শব্দকে আশ্রয় করে চলে। শব্দকে আশ্রয় করে আমরা সকল সময় চলি। সেই প্রণবের সুর, সকল সময় আমরা যাতে আছি, সেই সুরকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মৃদঙ্গের সুরে তানে লয়ে, আহারে বিহারে, সুখে দুঃখে সেই মন্ত্রকে, সেই সুরকে যদি আমরা অহর্নিশ বাজিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারি, তবেই সার্থক হয় আমাদের জীবন। তবেই অনাদি অনন্ত সুরকে আয়ত্তে আনতে বিশেষ কষ্ট হবে না। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা নাদধ্বনি দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলব

নবদ্বীপ, তাঁতের কাপড়ের হাট, নদীয়া
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

ভাইবোনেরা আজকের এই ক্ষেত্রে এই ধর্মসভায় কয়েকটি কথা বলতে এসেছি। এই ধর্মসভা শুধু নবদ্বীপেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় সমস্ত জনগণের সভাতেই হতে চলেছে। **যেদিন সমগ্র দেশে জেগে উঠবে এই ভাব, শুধু আমাদের দেশে নয়, সমগ্র জগতে, সেদিনই হবে আমাদের উপনিষদ, আমাদের বেদ সার্থক।** তোমাদের সেই দেশের যে বেদ, সেটাই তোমাদের আদি বেদ। সেই অন্তরাত্মা হতে, সেই কুলকুণ্ডলিনী হতে আদি বেদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সবাই এই পরিদৃশ্যমান জগতে ধরার ধারাপাতা ধরে ধরে এগিয়ে চলেছি। আমরা সবাই বেদ, সবাই উপনিষদ, সবাই গীতা। বীজ দেখলে বুঝা যায় না, গাছ দেখলে বুঝা যায়। ঋষিরা ভোজপত্রে যে বেদমন্ত্র রেখেছেন, সেই বেদ কোথায়? সেই বেদ আমাদের অন্তর আত্মায়। সেই বেদকেই স্মরণ করে আমাদের ভিতরের বীজগুলি ফুটিয়ে তুলতে হবে। **আমাদের যে হিন্দুধর্ম, এটা সমগ্র জগতের জন্য। এটাকে সীমাবদ্ধ করে হিন্দুধর্মকে আজ ছোট করে ফেলেছে।**

এই ধর্ম সূর্যের মত স্বচ্ছ। এই ধর্ম কোন জাত বিশেষের জন্য নয়, সকল জীবজগতের জন্য। সেই বেদ যে ভগবানের কথা বলেছেন, সেই ভগবান রয়েছেন জীবজগতে সকলকার মধ্যে লুকানো। কিভাবে একটি বটবীজ একটি বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হয়, সেতো আমাদেরই প্রত্যক্ষগোচর। আমাদের ভিতরে যে মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সপ্তসুর বা সপ্তচক্রের কথা বলা হয়েছে, সে তো বৃথা নয়। এই সুরকে

সাধলে সবকিছু জানা যায়। এই সুরে রয়েছে অণিমা, লঘিমা, অন্তর্যামিত্ব। এই সুরে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, আদি অন্ত। সেই কথা, সেই সুরের সাধনাই এই দেহবীণাযন্ত্রে বাজাতে হবে। এই মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে যে মূলমন্ত্র বা নাদ রয়েছে, তাকে জাগিয়ে তুলবো, সহস্রারে ফুটিয়ে তুলবো।

আমাদের মূলধ্বনি হচ্ছে মূলমন্ত্র। দুধে যেমন মাখন থাকে, তাকে মন্থন করে মাখন তৈরী করে নিতে হয়, আমরা এই মনযন্ত্রের মন্থনে সেই নাদধ্বনিকে আয়ত্ত করবো। **সেই নাদধ্বনি, প্রণবধ্বনি দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলবো। সেই সুরের অধিকার নিয়ে সবার জন্ম। আমরা যে মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন থেকেই সমস্ত অধিকারে অধিকৃত।** মন্ত্র কি করে আসলো? প্রণবমন্ত্র কি করে আসলো? বাচ্চা শিশু কাঁদে ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনিতে। সেই ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনির মন্ত্রে ওঙ্কারের সুর রয়েছে। বাচ্চা শিশুকে তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি। মা যখন প্রসব করেন, তখন কোন কবিতা থাকে না। তখন থাকে একটাই ধ্বনি, উঃ উঃ। সর্বকালে সর্বদেশে প্রসবব্যথায় কাতর মায়েদের এই একই ধ্বনি ওঃ ওঃ, উঃ উঃ। এটি স্বভাবজাত নৈসর্গিক। এই সুর মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত থাকে। সেখানে কোন গান বা কবিতা থাকে না। এই হুঙ্কার ধ্বনিতে রয়েছে প্রণবের মহামন্ত্র।

হাটে বাজারে কেনাবেচার সময় দূর থেকে শুধু একটাই শব্দ ভেসে আসে গুম্ গুম্। মন্ত্রগুলি এইভাবে ক্রমশঃ ভেদে ভেদে আমাদের মধ্যে আসে। সঙ্গীতের ধ্বনি ত্যানা ত্যানা করতে করতে খেয়াল ঠুংরীতে চলে গেল। তখন তানপুরার তানে চললো। আমাদের ভিতরেও সেইভাবে একটা অন্তর্নিহিত শব্দ আছে। যদি সেই শব্দকে সারেগামা-র মত সাধনা করি, তবে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সুর আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে। আর আজকের ধর্মে আমরা কি করেছি? শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর বানাচ্ছি। ধর্মের কোন জাত নেই। আমরা সব

একজাত। এক সূর্য, এক চন্দ্র, এক পৃথিবী। আমাদের জাত বিচার হবে কর্মের ভিতর দিয়ে। সূর্যের কোন জাত বিচার নেই। জাতিগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা আমরা সৃষ্টি করেছি। আমরা সেই অন্তর্নিহিত সুরের সাধনা করবো। আমরা সকল সময়ে যদি সুরের চর্চা করি, তখন ভিতর হতে যে সুর দেবে, আমরা সেই সুরে সুরজ্ঞ হবো। আমাদের শাস্ত্র সমতা রক্ষা করে। অদ্ভুত তার তান, গান। **শাস্ত্র হচ্ছে অনন্ত। শাস্ত্রে রয়েছে বিরাট বীজ। যদি এটাকে সাধনা করা যায়, তবে ভিতর হতে একটা গুরুগম্ভীর শব্দ বা আওয়াজ (ধ্বনি) সৃষ্টি হয়। এই গুরুগম্ভীর আওয়াজেও একটি হুঙ্কার আছে। এই আওয়াজ বা ধ্বনিই হচ্ছে সৃষ্টির মূল। এই ধ্বনি হচ্ছে স্রষ্টা।** এই মূর্ত্তি পূজা রয়েছে নিজেদের ভিতরে। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির নানাদিক দিয়ে বস্তুর বস্তুত্বকে বুঝাবার জন্য, নানাভাবে নানা মাহাত্ম্যে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন সৃষ্টির উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্যটি, যাতে কিভাবে নিজেকে জানা যায়। সকলের ভিতরেই প্রকৃতির সমস্ত ক্ষমতা আছে। শুধু ফুটিয়ে তোলার অপেক্ষা। ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। আমাদের হতে বাধ্য। বেদের ধারাবাহিকতায় আমরা চলবো। এই বেদ আমাদের জীবন গ্রন্থ। এতেই রয়েছে সব। ফুটিয়ে তুলতে হবে এই বেদ। তবেই জানতে পারবে নিজেকে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানারকম সাধু গুরু এসে ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। কারণ তারা প্রকৃত গুরু নয়; গুরু সেজে বসেছে। তারা শাস্ত্রজ্ঞ নয়; শাস্ত্রজ্ঞ সেজে বসেছে। অল্প কথাতে তত্ত্ব বলা সহজ নয়। অল্প সময়ের মধ্যে তত্ত্ব বলা সম্ভব নয়। অহঙ্কার বা অহমিকার কথা নয়। আমি ৫ বছর ৩ মাস হতে দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেছি। আগে থেকে কিছু না জানলে, ভিতরে কিছু না থাকলে একটি ৫ বছরের শিশু দীক্ষা দিতে পারে না। আমি কোন শাস্ত্র পড়িনি। আমি খনির কাজ করি। আমি খনির শাস্ত্র বলতে পারি। সেই খনি

থেকে তত্ত্বের মণিমুক্তা আহরণ করে জগতের দ্বারে দ্বারে আমি পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি। যে মহামূল্যবান রত্নের সন্ধান পেয়েছি, তাই জন সম্মুখে পৌঁছে দিচ্ছি। এই পৃথিবীই আশ্রম। এই জগৎটাই আমাদের আশ্রম। আমাদের সাধনা শুধু এই ৩/৪ কাঠা জমির সাধনা নয়। ব্যক্তিগত ৩/৪ কাঠা যার যার আপন হয়ে যায়। এই ৩/৪ কাঠা জমি পৃথিবী ছাড়া নয়। ৩/৪ কাঠার বাড়ী আমাদের স্বাধীন চিন্তায় নেই। আমাদের বাড়ী ৪ কোটি কাঠা করে দিলে ব্যাপক চিন্তা আসবে।

একটি মানুষ যদি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তবে সত্য প্রতিষ্ঠা হবেই। আমি কর্মী, নিজের নীতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাব। **আমি এখানে গুরু সাজবার জন্য আসিনি। আমি জানিয়ে দিয়ে যাব কোথায় ভগবান, কোথায় বেদ। সবাই আমরা একই স্কুলের ছাত্র। সেই সুরকে খনি থেকে নিয়ে এসে পৌঁছে দেব জগতের দ্বারে দ্বারে।** এই বিশ্বখনিতে সব লুকানো রয়েছে। মূলাধারের মূলসুরকে যদি সহস্রারে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তবেই জেগে উঠবে সেই নিনাদের ধ্বনি, যাতে রয়েছে সেই অনন্ত সুর। তাই জাগিয়ে তোল সেই মহাশক্তি, জাগিয়ে তোল সেই মহা সুর। আমরা যাত্রিক। পথের পাথেয় তো দরকার। হে পথিক, হে যাত্রিক, আমরা রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে চলেছি। হে যাত্রিক, তোমরা বাস্তবিক সুরের দিকে থেকো। সুরকে যেন ভুল করো না। আমি মহানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি এখানে গুরু, অবতার সাজতে আসিনি। আমি সকলকে সত্যিকারের সুর জানিয়ে দিতে চাই। **এক আত্মা, এক জ্ঞান, এক প্রেম যেদিন অন্তরে অন্তরে অনুভূত হবে, সেদিনই হবে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উদ্ধার। সেদিনই হবে আজকের প্রতিবাদের সফল রূপায়ণ।** আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমি জন্মগত সুর নিয়ে এসেছি। ভিতরকার খনি থেকে মণি তুলে এনে তোমাদের দিচ্ছি

২৮, শরৎ বোস রোড, ল্যান্সডাউন টেরেস, কোলকাতা-২৬
২৩শে এপ্রিল, ১৯৬৭

তোমাদের এই দেহবীণাযন্ত্রে যে পর্দা আছে, সেই সাতটি পর্দার সপ্তচক্রে আছে সাতটি সুর— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। মূলাধারে যে সর্প কুলকুণ্ডলিনীরূপে অবস্থান করছে, সে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো। নাদধ্বনিতে, হুঙ্কারধ্বনিতে এই সর্প জাগরিত হল। বিশুদ্ধে হল শোধন। সেই বিশুদ্ধ শোধন করলেন অনন্ত ক্লেদ। মূলাধার হতে সর্প সহস্রারে উঠলো। সহস্রারে সহস্রসূর্যের কিরণ উদ্ভাসিত হলো। আবার আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে মন নিবিষ্ট করলে জ্ঞানলোকে বিচরণ করা যায়। আজ্ঞাচক্রে চিন্তা করলে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না থেকে একপ্রকার রসের ধারা নির্গত হয় এবং তাতে প্রকৃতির সাথে এক বিরাট মিলনের সুর, এক বিরাট সঙ্গম চলতে থাকে। এইভাবেই মহাকাশের সাথে সহস্রধামে সহস্রলোকে শিবশক্তির মিলন হলো সহস্রধারাতে। শিব নিজে বলেছেন, তিনি ছিলেন মহাবৈষ্ণব। তিনি পার্বতীর সুরের সাথে এক সুর হয়ে নিজের গভীর সুরে ডমরু বাজিয়েছিলেন। সমস্ত অবস্থায় সহস্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ, শিব ও শক্তি পরম মিলনে যুক্ত হয়ে কি করেছিলেন? বেদ, উপনিষদ চলে গেল। জ্ঞানের অমৃত ধারাতে খণ্ড খণ্ড চিন্তা, খণ্ড খণ্ড জ্ঞান অখণ্ডে বিলীন হলো। সব নিম্নগামী হয়ে গেল। কেবল তিনিই (শিব) হলেন ঊর্দ্ধগামী। এইভাবে শিবলিঙ্গ এলো। আমরা

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে সেই লিঙ্গপূজা করছি, লিঙ্গের উপাসনা করছি। মূলমন্ত্রের মূলধারায়, মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে বীজমন্ত্র নিহিত। মূলমন্ত্রের মূলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই লিঙ্গপূজা করছি, পদসেবা করছি, সেই পদরেণুর পূজা করছি।

এই সুর এল কোথা হতে? সেই শিবশক্তির পরম মিলনের সুরধারা, সহস্রারের সহস্র স্তরের সহিত একসুরের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। আবার সহস্রারের সহস্র ধারা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই ত্রিধারায় নামলেন। সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা মিলিত হলো ত্রিবেণীতে আজ্ঞাচক্রে। সমস্ত দেহ একসুরে সুরময় হয়ে এই সপ্তধ্বনি সপ্তসুরে বেজে উঠবে সর্ব অবস্থায়। এই ধ্বনি নাদধ্বনি ধ্বনিত হয় সর্ব অবস্থায় সমস্ত বস্তুতে। এই পরম অবস্থার পরম তৃপ্তিতে, মূলাধার হতে সহস্রারে সপ্ত সুরের সমন্বয়ে ঝঙ্কৃত হয়েছে নিনাদের সুর। সেই সুর জেগে উঠছে, বেজে উঠছে নীলাকাশে, সূর্য যেখানে সেই তেজে তেজোময় হয়ে রয়েছেন জ্যোতির্ময় সুরে। মহাশূন্যে মহাকাশে অজস্র অজস্র গ্রহ নক্ষত্রের সম্মিলনে বেজে উঠেছে সপ্তধ্বনির সুর। সেই সুর রয়েছে জীবনের প্রথম ধারাপাতায়, প্রকৃতির আদর্শলিপিতে। সেই সমন্বয়ের সুরে বেজে উঠছে সমস্ত বিশ্ব। সমস্ত বিশ্ব যে নাদে বাঁধা, সেই নাদে প্রতিটি অণুপরমাণু বাঁধা। তাতেই রয়েছে ধ্বনি; তাতেই রয়েছে চেতন, সচেতন। সেই সুরেই মহাপ্রভু দুবাহু তুলে বলেছেন, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরি হরণ করেছেন। আবার সেই হরিকেই স্মরণ করেছেন রাধাকৃষ্ণের মিলনের সুরে। মহাপ্রভু ত্রিনেত্রে আজ্ঞাচক্রে মনোনিবেশ করে সেই ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে, সেই ধ্যানে ধ্যানমগ্ন হয়ে অহর্নিশ সেই সুর, সেই নাম স্মরণ করেছেন। মূলাধার থেকে সহস্রারে বেজে উঠছে সেই নাদ। সেই মহানামের ধ্বনি, মহানাদের ধ্বনি শুধু আকাশে বাতাসে নয়, সর্ব অবস্থায় আমাদের দেহবীণার মধ্যে রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেহবীণাযন্ত্র বাজাতে বাজাতে হুঙ্কার ধ্বনিতে মেঘগর্জনের সৃষ্টি হয়। সাগর নীচে; আবার গুরুনিনাদে মেঘগর্জনের সাথে সাথে সহস্র ধারায় বারিবর্ষণ হতে থাকে। সেই সাগর হচ্ছে মূলাধার। সাগর থেকে, মূলাধার হতে টেনে নিয়ে সহস্রারে বারিবর্ষণ হয়। গর্জনের মন্ত্রই হচ্ছে নাদ। এই নাদ, এই ধ্বনি হচ্ছে মূলাধার হতে, পৃথিবী হতে, পদসেবা হতে। সেই পদে যুক্ত হয়ে, সেবাইত হয়ে, মূলাধারের সুরের সঙ্গে, প্রণব মন্ত্রের সঙ্গে একসুরে যুক্ত হয়ে বাজাতে হবে অবিরাম। সেই মন্ত্র রয়েছে মূলাধার হতে সহস্রারে। আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশে এই মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনে সকলই সম্ভব। অদৃষ্ট বা কর্মফলের উপর দেবতা কাউকে রাখেন নাই। এই মহাস্রষ্টা সমসুরে সবাইকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। তোমাদের যেকোন অবস্থায় যেকোন মুহূর্ত্তে নির্বাণ হতে পারে, সিদ্ধি হতে পারে, মুক্তি হতে পারে, সমাধি হতে পারে। তারজন্য কর্মফলে আটকায় না। পূর্বজন্মের উপর নির্ভর করে না।

শিব বলেছেন, যেখানেই তুমি থাকো, ছিটালেই (আস্তাকুঁড়ে) থাকো বা পাপের মধ্যেই থাকো, যে কোন মুহূর্ত্তে গোবরে পদ্মফুল ফুটবে। যে কোন মুহূর্ত্তে ধাপায় ফুল ফুটতে পারে। কারণ এই আবর্জনা যে সার হতে পারে; যে ষাঁড়ের (সারের) লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে যায়। সেই সার আবর্জনার মধ্যেই রয়েছে। এটা হচ্ছে আবর্জনার সার। এখানে ঘি, দুধ ঢাললে হবে না। এই ষাঁড়ের লেজ ধর। সুতরাং শিব কি করলেন? সেই ষাঁড়কে বার করে তিনি তাকে বাহন করলেন। এই ষাঁড়কে ধর। এই জাগতিক ক্ষেত্রে, এই রোগ, শোক, দুঃখে ভরা জীবনে যে কোন অবস্থায় যেকোন মুহূর্ত্তে জীব শেষ হয়ে যায়। শিব বলছেন, তোমাদের মতো সাধারণ হয়ে যে অসাধারণ শক্তিলাভ করেছি, তা এই ষাঁড়ের উপর বসে। আমিই শুধু এই ষাঁড়কে বাহন করি নাই। সেই ষাঁড়ের উপর তোমরাও সবাই রয়েছ। তোমরাও

ষাঁড়কে বাহন করেছ। তার লেজ ধর। এই অসারকে ষাঁড় (সার) কর, যেখানে সিদ্ধি, মুক্তি নির্বাণ রয়েছে। সবকিছু আকাশময় হয়ে রয়েছে; সেখানেই মহামন্ত্রের সুরের দরজা খোলা আছে। এই অসারকে সার করে মহাপ্রভু দু'হাত তুলে পরিব্রাজক হয়ে অগ্রসর হয়েছেন। সেইভাবে জীবন চালিত করেছেন। নিজের মধ্যে আপন সুরে বিলীন হয়ে, পরিতৃপ্তির সুরে সুরময় হয়ে, অপরূপ দর্শন করে তোমরা পরমানন্দে থাকতে পার; যে সুরের ব্যাখ্যা হয় না। সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

কার পিছনে ধাইছো? পরমতৃপ্তির জন্য, এই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য, যশের জন্য কত কি করছো। এই তৃপ্তির জন্য কত বড়াই করছো। এই তৃপ্তি পরমানন্দের আংশিক কণামাত্র। সেই পরমানন্দ না পাওয়া পর্যন্ত এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকের সাময়িক তৃপ্তিই থেকে যায়। পরমসুরে পরমানন্দের সুরে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পরমতৃপ্তি মিলবে না। এই আংশিক তৃপ্তি কেন? প্রাথমিক আভাষ; সূর্য উঠবার প্রাথমিক ইঙ্গিত। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি আংশিক পূর্বাভাষ। সূর্য উঠবার যে অবস্থা, সূর্য যখন উঠবে, তার আগেই আকাশে লালের আভাষ। সেই পরমসূর্য উঠবার পূর্বকালীন যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, সেই তেজ সেই আলো যখন তোমার ভিতর প্রতিফলিত হবে, তখন সূর্যই তোমার দেবতা। সেই অন্তঃসূর্য (অন্তরের সূর্য) সপ্তচক্র ভেদ করে যখন সহস্রারের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হবে, তখন দেখবে, 'তুমি কে? কোথা হতে এসেছ?' তখন এক সুরে এক ধ্বনিতে সব চলে আসবে। আর তখনই বুঝবে, 'কেন এসেছ? কোথায় যাবে?' সৃষ্টির মাহাত্ম্য, কিসের জন্য জপতপ, জীবনে চলার পথে রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য কেন? এসবের প্রয়োজন কি? সবকিছু সমস্যার একেবারে সমাধান হবে। সর্ব অবস্থায় যে এত হৈ চৈ, সব শান্ত হয়ে যাবে, তোমার ভিতরে সূর্য যখন উদ্ভাসিত হবে। সেই সূর্য তোমার ভিতরে

আছে; কিন্তু আজ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় লুক্কায়িত।

তোমরা সবসময় পবিত্রতার মাঝে মনকে অচল অটল রেখে, শুদ্ধ রাখ। তখন Fog (কুয়াশা) কেটে যাবে। সূর্য জেগে উঠবে। এই সূর্য তোমার ভিতরে $95^0/96^0$ ডিগ্রী আকারে রয়েছে। এই সূর্য কেমন? অপূর্ব তার অনুভূতি, অপূর্ব তার আখ্যা ব্যাখ্যা। এই সূর্য যখন ফুটে উঠবে, তখন বুঝবে কোথায় ছিলে? আজ সেই সূর্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। মেঘ সূর্য ছাড়া নয়। অন্ধকার সূর্য ছাড়া নয়। কুয়াশা সূর্য ছাড়া নয়। কুয়াশা সূর্যেরই তৈরী। সূর্য না থাকলে মেঘ হতে পারে না। ''হয় না, হবে না'', এগুলো হওয়ারই কথা। সমস্যার কথাগুলো হচ্ছে মেঘের মত কথা। সমস্যার কথাগুলো হচ্ছে কুয়াশার মতো কথা। আজ আমাদের জীবনের সমস্যার যে কথা, দ্বন্দ্বের যে কথা, সূর্য আড়ালে আছে বলেই আসছে এসব কথা। সুতরাং এই ইঙ্গিত তোমাদের বুঝে নিতে হবে। আপন মনে আলো জেগে উঠবে। অন্ধকার সরে যাবে। সেই বৃত্তির নিবৃত্তির আবৃত্তি যদি তৈরী করতে পারি, সূর্য ফুটে উঠবে। তোমরা যে তারই প্রকাশ, তারই বিকাশ, সেটা তখন উপলব্ধি করতে পারবে।

আমি যা বলি, প্রত্যেকটা জিনিস ভাল করে বুঝবে। আমি জন্মগত সুর নিয়ে এসেছি। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। ভিতরকার খনি থেকে মণি তুলে এনে তোমাদের দিচ্ছি। এখানকার যত সমস্যা, বুদ্ধি নিয়ে যদি কাজ করো, সমাধান করতে দেরী হয় না। তেল, জিরা, তরকারী, আগুন সব রয়েছে। এখান থেকে টেনে নিয়েই স্বাদ তুলতে হবে। সৃষ্টিতেই সব আছে। যা কিছু ছিল বা আছে, তাই-ই বের করছে। নতুন করে কিছু বের হয় নাই। বিদ্যুৎ ছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে আলো করছে। যা চিরকাল আছে, সেটাই শূন্য। যত জীবন সব শূন্যের বস্তু। কারণ বাতাস যাদের প্রাণ, জল যাদের প্রাণ, তারা কি কখনও স্থূল হতে পারে? কয়েকটি সাগর

বাতাসে আছে। জল যে বাতাসে উড়ছে, দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। যে বাতাস খেয়ে প্রাণ, যে জল খেয়ে প্রাণ, তা হতে যখন এসেছি, তখন আমরা সূক্ষ্মই। সূক্ষ্ম হতে আমরা এসেছি। বহু বহু বস্তুর সম্মিলনে এই দেহ। এখানকার বস্তু যে দেহ, এই দেহকে খুঁজতে গেলে জলে যাবে। বাতাসে যাবে। আমরা এমন সূক্ষ্ম ছিলাম, এই দেওয়ালও আমাদের কাছে মনে হ'ত ফাঁকা। শূন্য ছাড়া, বাতাস ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয় ছিল না। কোন জায়গায় স্থান নেই, এমন সূক্ষ্ম। সেই সূক্ষ্ম হতে মাত্রা নিয়ে যদি বসে পড়ি, কেন হবে না?

সৃষ্টির নিয়ম হলো, যেই সূক্ষ্ম জিনিস হ'তে তুমি এসেছ, সেই সূক্ষ্ম জিনিসে তুমি বিলীন হয়ে যাবে। ডিমের 'তা' যেই মাত্রায়, সেই মাত্রায় ডিম ফোটে। বেশী তাপেও হবে না; কম তাপেও হবে না। মুরগী বা হাঁস যে 'তা' দেয়, সেই 'ওম্' বা সেই মাত্রা তুমি যদি আনতে পার, ফটাস ফটাস করে বাচ্চা হবে। তাহলে আমরা সেই সূক্ষ্মের 'তা' টা যদি নিয়ে আসি প্রতি মুহূর্ত্তে, সেই 'তা'তে দেহ নিমেষে উবে যাবে। আমাদের অনন্ত মধুকরের দেহ নিমেষে উড়বে। আবার দেহ নিয়ে বসবে। যেকোন মুহূর্ত্তে উড়ে যাবে, সেই মাত্রার 'তা' টা যদি দাও। সেই মাত্রা আসে কিসে? ধ্বনিতে বা নাদে। আমাদের দেশে মৌমাছিরা যখন উড়ে যায়, শঙ্খ ধ্বনি করে, ঘণ্টা পিটায়। সেইরূপ মধুকর একটা ঘণ্টা চায়, মানে এই ধ্বনি বা মন্ত্র চায়; যে ধ্বনিতে জেগে উঠবে সেই মৃদঙ্গের সুর। তখন এই মধুকর সেই ধ্বনির মাঝে লীন হবে। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

লক্ষ কোটি বছরের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আমরা এই জগতে এসেছি

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কোলকাতা-১৬
৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭

মহাকাশে মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র বিরাজ করছে অনন্ত গতির পথে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে। এই যে সূর্য প্রতিদিনই যাকে আমরা দেখি, কোটি-কোটি বছর ধরে জ্বলছে দাউ দাউ করে মহাশূন্যের বুকে। এত আগুন কে জোগাল? কত দূরে থেকে সূর্য তার তেজে বাঁচিয়ে রেখেছে পৃথিবীর সবাইকে। সমস্ত দূষিত জিনিসকে টেনে নিয়ে সূর্য কেমন স্বচ্ছ পবিত্র করে দেয়। সূর্যের ভিতরে একটা ধ্বনি সদাই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অজস্র অগণিত কণিকার ভিতর দিয়ে সূর্য তার তেজ সরবরাহ করে। এই তেজ ক্রমশঃ ক্রমশঃ পৃথিবীতে আসে। প্রতিটি তেজ কণিকাতে শব্দ আছে, ধ্বনি আছে। সেই ধ্বনিই আমাদের ভিতরে ধ্বনিত হচ্ছে। এই ধ্বনিই হচ্ছে বেদমন্ত্র।

এই বেদমন্ত্র কি করে এল? বেদ হচ্ছে প্রকৃতি, বেদ হচ্ছে আকাশ, বেদ হচ্ছে বাতাস। বেদ হচ্ছে জ্ঞান, বিচার, বিবেক, সূর্য। প্রকৃতির মাঝে, মহাশূন্যের মাঝে যে অনন্ত নাদধ্বনি, তাহাই বেদধ্বনি, বেদমন্ত্র। ঐ ধ্বনির বিষয় বস্তুই সুর। সুর কি করে? সুর আরও গভীর সুরে টেনে নিয়ে যায়। মহাশূন্যের মাঝে 'নাই' হয়ে রয়েছে সব কিছু। যেই জিনিসের আবির্ভাব হয়, তাহা 'ছিল' বলেই আবির্ভূত হল। সেই জিনিসকে আশ্রয় করে আবার অন্যান্য বিষয়বস্তু বহির্গত হতে থাকে। যেখানে সম্পর্ক থাকে, সেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিটি গ্রহ

উপগ্রহ একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে যুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে মহাশূন্যের মাঝে ঐ সমস্ত গ্রহে উপগ্রহে আমরা কেন যেতে পারি না? যেতে পারি। আমরা দর্শনে যাচ্ছি। অনুভূতিতে যাচ্ছি। চিন্তার সাথে সাথে গমন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই যাতায়াতে আমরা তুষ্ট হই না। আমাদের বুঝটা সজাগ হয় না। তাতে আমাদের সত্তাটা ঐসকল গ্রহে উপগ্রহে যাওয়ার ব্যবস্থার সাথে পাকাপাকিভাবে যুক্ত হতে পারছে না। কিন্তু যে জিনিস মনের মধ্যে আসে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দর্শনে আসে, অনুভূতিতে আসে, সেখানে সহজেই যাওয়া যায়।

লক্ষ কোটি বছরের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আলো, জল, বাতাস ও অন্যান্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর মিশ্রণে মিশ্রিত হতে হতে, জমাট বাঁধতে বাঁধতে আমরা এই জগতে এসেছি। এই দেহ সেই যোগাযোগ সূত্রের বিষয়বস্তুর দ্বারা গঠিত আছে বলেই আজও পরিবর্ত্তন হচ্ছে, দেহের রূপান্তর হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পরিবর্ত্তনের সাথে, নিজের বুঝের সাথে, ব্যক্তিত্বের সাথে চির যোগাযোগের বুঝ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। আমরা যদি সেই সূত্র ধরে অগ্রসর হই, নিশ্চয়ই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবো।

কোন বাড়ির দেওয়াল বেয়ে উপরে ওঠা একরকম, আর সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা অন্যরকম। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠলে বাড়ি যত তলাই হোক না কেন, সর্বোচ্চ তলায় উঠতে পারা যায়। প্রকৃতির গতির সাথে গতি মিলিয়ে, যাওয়ার গতি যদি ঠিক থাকে, বুঝ যদি ঠিক থাকে, তবে অন্য গ্রহে উপগ্রহেও যেতে পারবে। আমাদের এই দেহবীণাযন্ত্রে এমন সিঁড়ি রয়েছে, সেই সিঁড়ি ধরে ধরে আমরা সহস্রারে পৌঁছাতে পারবো। সিঁড়িকে বাদ দিয়ে যদি আমরা এদিক ওদিক

ঘোরাফেরা করি, তবে কোনদিনই পৌঁছাতে পারবো না।

আমাদের চিন্তাধারাকে মহাজগতের চিন্তাধারার সাথে সাথে এক অভিন্ন যোগসূত্রে গেঁথে নিতে হবে। দেহবীণাযন্ত্রে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার— এই যে সপ্তচক্র, এই সপ্তচক্রের মাধ্যমে দেহে যে মানচিত্রের পরিচয় দিয়েছে, সেই পরিচয়ের মাধ্যমে যদি যাই, সিঁড়ির ধাপে ধাপে যদি অগ্রসর হই, তবে আমরাও লক্ষ্যে পৌঁছাবো। সমস্ত যোগী ঋষিরা এই যোগসূত্র ধরে ধরে পৌঁছে গেছেন সাধনার বিভিন্ন স্তরে। আমরাও তারই পথিক। সেই অনন্ত পথের যাত্রিক। আমরাও সেই পথ ধরে অগ্রসর হবো মহাতীর্থের সঙ্গমস্থলে।

সেই সিঁড়ির পাশে তোমরা বসে আছ। সেই সিঁড়ির ধাপে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ। তোমরা খুঁজে খুঁজে এগিয়ে যাও। নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে সেই নিখোঁজের সন্ধান। সেই সিঁড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাও। সময় নষ্ট করো না।

সুতরাং নাম কর, জপ কর। সংসারের সব কিছু করো। এখানে সাময়িক সুখের নেশায় যে মেতে আছ, তাতে তো তৃষ্ণা মিটছে না। এটা শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের নেশায় এই যে মাতোয়ারা হয়ে থাকা, এ সবই সাময়িক। এসব মুছে যাবে, মুছে যাবে। পথিক, ভুল করো না। ভুল বুঝো না।

সেই যে সূর্য, অনন্ত তেজের আকর (খনি), সেই সূর্য যে জিনিস সৃষ্টি করতে পারে, সেটা আবার নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। সেই সূর্য শক্তি নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাইকে কোল দিয়ে, দোষ মুক্ত করে জানার পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যান। তোমরা সেই পথের পথিক। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে সেখানে পৌঁছাতে পারবে। তোমরা সূর্যের সাথে, আলোর সাথে যুক্ত

হয়ে আছ। এই যে রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা— এক মুহূর্তে রোগমুক্ত হয়ে যাবে। যে বিষয়বস্তু হতে জীবাণু সৃষ্টি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়বস্তু হতেই আবার রোগ নিবারণ হয়।

এই অণিমা, লঘিমা, মহিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মহাতীর্থের সাথে যুক্ত করে, সব রোগ হতে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে যান। সাময়িক তৃপ্তির নেশায় যে সমস্ত বিষয়বস্তুতে আটকে রয়েছ, সেই সমস্ত বিষয়বস্তু থেকে মুক্ত করে চির আনন্দময় ধামে নিয়ে যান। তোমরা সেইভাবেই আছ। পরম আনন্দময় ধামে যাবে, নিশ্চিন্ত থাক। কাজ করে যাও।

শরীরটা অসুস্থ। বাচ্চা বয়স হতে হাজার হাজার রোগ সারিয়ে সারিয়ে, নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। কণা কণা শক্তি একত্রিত হয়েই পাহাড়তুল্য হয়ে যায়। তোমাদের কাছে এসেছি, আমার স্নেহ ভালবাসা দিয়ে, তোমাদের কোল দিয়ে যাতে নিয়ে যেতে পারি। যাক, চিন্তা কোর না। মনে প্রাণে জপ করে যাও। একটানা ১৮ ঘণ্টা, ১৯ ঘণ্টা বসে থেকে শরীরটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ জড়িয়ে ধরছে। দিনরাত আঁতুর ঘরে বসে থাকা যেমন, আমাকে সেইভাবে পড়ে থাকতে হয়। তোমরা গভীরভাবে কাজ করে যাও। দরজা তোমাদের খোলা। দর্শন তোমাদের হবেই। বীজ যখন দিয়েছি, ফুটবেই। তবে নিজেরা কাজ করলে একটু তাড়াতাড়ি হয়। আমার পরিশ্রমের লাঘব হয়। নতুবা একটু দেরী হয়। তবে যাহাই হোক, বীজ তোমাদের ফুটবেই। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন ডট কম্

www.avinabadarshan.com

অভিনব দর্শন ডট কম্ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে Web দুনিয়ায়। এই Website-টি জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্বময় কর্মজীবন ও বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই Website-টি বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের অন্তর্গত ১০-১২টি সংগঠন বা কোন ট্রাষ্টের official site নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে কিছু ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত ও পরিবেশিত। এই Website-টি সম্পূর্ণ মুক্ত এর জন্য কোন Donation বা অনুদান গ্রহণ করা হয় না।

আমাদের দেশে হাজার হাজার বছর আগে বেদের যুগে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ অশ্রুতপূর্ব তত্ত্ব ও তথ্য প্রাঞ্জল ভাষায় উদ্ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন পূর্ণত্বে, ব্যাপ্তিত্বে, বস্তুনিষ্ঠায় যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা সৃষ্টির ধারার মত সাবলীল, স্বচ্ছ ও সর্বজনগ্রাহ্য, সেই আদিবেদের সঙ্গে অধুনা প্রচলিত সাম্যবাদের কোথায় কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় কোথায় পার্থক্য তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন।

এই Website-এর উদ্দেশ্য হলো, আদিবেদের প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনকে তুলে ধরে সমাজকে জাগিয়ে তোলা। বেদের তত্ত্বকে আশ্রয় করে ধর্মনীতি, রাজনীতি, মন্ত্রতন্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা গুলির প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা এবং সমাজের বুকে সেই আদর্শের সার্থক রূপায়নের মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তোলা এবং সমাজে জনজাগরণ ঘটানো। তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়, ''জনচেতনা প্রথমে আন কলমে, কামানে নয়। ন্যায়, নিষ্ঠা, সত্যের সেই কলম চালিয়ে যাও।'' তাই লেখনির মাধ্যমে আদিবেদের তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ প্রচার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

বেদনীতিই হলো জীবনীতি — জীবের সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি — যা আজকের সমাজ প্রায় বিস্মৃত। আমাদের কাজ হলো, বেদনীতি প্রচারের মাধ্যমে সমাজে জনজাগরণ করা। বেদের যুগের শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি আবার ফিরে আসুক, এটাই হলো আমাদের মুখ্য কামনা। তাই আদিবেদের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বের আলোকধারাকে সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ববোধে আমাদের এই Website অভিনব দর্শন ডট কম্।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এসেছেন ইতিহাসের ধারায়, জন্ম থেকেই প্রকৃতির নিজস্ব সুর নিয়ে। তাই অষ্টসিদ্ধিতে তাঁর জন্মগত অধিকার। সেইজন্যই বাস্তবের কোন মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার করা চলে না। নিজ নিজ উপলব্ধির স্তর বা মাত্রা থেকে তাঁকে বুঝতে হবে। তাই আমাদের প্রিয় Viewer-দের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামতকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।

অভিনব দর্শন ডট কম্-এর পক্ষে
চপল মিত্র

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩)	বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪)	চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৩৫)	মহা জাগরণ	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭
৩৬)	পাপ পুণ্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮
৩৭)	মুক্তির পথ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮
৩৮)	ঘুম সমাধি সাধনার চাবিকাঠি	শুভ মহালয়া, ১৪১৮
৩৯)	পরমপিতা	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৮
৪০)	স্রষ্টার সৃষ্টি ভাবনা	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১১
৪১)	জ্ঞানচক্ষু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৮
৪২)	সপ্তচক্র	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৯

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫